GOVERNMENT OF TRIPURA

FICE OF THE DEPUTY CHIEF MINISTER

AGARTALA.

Dated.................................

ভারততীর্থ

ভারততীর্থ

প্রথম তরঙ্গ

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

বিচিত্রা

৬ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিট, কলকাতা-১২

ধরতী সব কাগদ করুঁ লেখনি সব বনরায়
সাত সমুদ্র কী মসি করুঁ গুরুগুন লিখা ন জায়

ছাত্রবৎসল অধ্যাপক
শ্রীহেরম্ব চক্রবর্তী
শ্রদ্ধাস্পদেষু

যদিদং ভারতং বর্ষং যত্র মে সজ্জতে মনঃ
সেই ভারতবর্ষের কথা বলছি—অরণ্যমেখলা সমুদ্র-স্তনিত ভারতবর্ষ, মরু-চুম্বিত গিরি-বন্দিত ভারতবর্ষ, নদীজপমালাধৃত-প্রান্তর ভারতবর্ষ……

কিন্তু হায়, কোথায় বা ভারততীর্থ আর কোথায় বা অল্পমতি ভ্রামণিক! বহুভাষিত বহুবিচিত্র যে দেশের কথা বলতে গিয়ে স্বয়ং সঞ্জয়কেও একদা পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল, সেখানে সে বৃথাই কালি ছিটিয়ে মরবে……

মোহাচ্ছন্ন মুসাফির! অষ্টাদশপর্বী বিশাল মহাভারতও যার অন্ত পায়নি, সেই মহাসমুদ্রে তুমি ভেলা ভাসিয়েছ। তরঙ্গে তরঙ্গে সমুদ্র উচ্ছ্বসিত, তুমি মুঠো ভরে নিয়ে এলে শুধু ফেনা—প্রথম তরঙ্গের এক মুঠো ফেনা……

কাবেরী নদীর তীরে

হাওড়া স্টেশনের ন-নম্বর প্ল্যাটফরম।

বিপুল জনতা উদগ্রীব হয়ে আছে কখন তিনি আসবেন। প্ল্যাটফরম-ঘড়ির বড়ো বড়ো কাঁটা দুটো সময় নির্দেশ করছে— অপরাহ্ণ পৌনে চার। আর মাত্র পঁয়ত্রিশ মিনিট, অথচ—

জনতার চোখেমুখে উদ্বেগের চিহ্ন। সকলেই অধীর আগ্রহে মিনিট গুণছে তার পথের দিকে তাকিয়ে। অবশেষে তিনি এলেন। গুরুগম্ভীর চালে ধীরমন্থর বেগে অনেকটা যেন গজেন্দ্র-গমনে তাঁর আবির্ভাব হল।

এরই নাম ম্যাড্রাস মেল।

২১শে ডিসেম্বর, ১৯৫৭। অপরাহ্ণ চারটে বিশ মিনিট। আমাদের যাত্রা হল শুরু।

ততোক্ষণে বেশ গুছিয়ে বসেছি আমরা। ছোট্ট তৃতীয় শ্রেণীর কামরা। ১২ জনের সংরক্ষিত আসন। কিন্তু যাত্রী আমরা ১৫ জন। চারজন অপরিচিত অবাঙালি। আর আমরা পশ্চিম-বঙ্গের অধ্যাপকপুঙ্গব সংখ্যায় এগারো। আমাদের উদ্দেশ্য মাদ্রাজে অনুষ্ঠেয় নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনে যোগদান এবং তৎসহ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ। এক ঢিলে দুই পাখি।

সংরক্ষিত কামরায় যে অতিরিক্ত তিন ব্যক্তির প্রবেশ ঠিক আইনসিদ্ধ হয়নি তাঁরাও অধ্যাপক। কিন্তু উৎসবে ব্যসনে যদি আমরা পরস্পরের পাশে না দাঁড়াই তবে বন্ধু কিসের? রাতের

অসুবিধার কথা কেউ গ্রাহ্যই করিনি। সকলেই সংলাপে মশগুল। ঠিক সংলাপ নয়, খানিকটা প্রলাপও বটে। গতির আনন্দ দোলা দিয়েছে আমাদের প্রাণে। এ তো একক দেশ-ভ্রমণ নয়, এ যেন হংস-বলাকার নিরুদ্দেশ যাত্রা। পিছনে পড়ে রইল আমাদের অহোরাত্র সংকীর্তনের আসর অর্থাৎ দিবারাত্রির কলেজ, পারসেনটেজ দেওয়ার ঝঞ্ঝাট আর প্রেরণাহীন যান্ত্রিক বক্তৃতা দানের পবিত্র কর্তব্য ও দায়িত্ব।

বৈকালিক জলযোগের সময় হতেই ক্ষুধার উদ্রেক হল। কিন্তু গাড়ি দাঁড়াবে সেই খড়্গপুর। ততোক্ষণে সন্ধ্যা পার হয়ে যাবে? তাহলে?

আমাদের উদ্ধারকল্পে এগিয়ে এলেন ইতিহাসের প্রবীণ অধ্যাপক প্রমথনাথ চক্রবর্তী। যাঁরা বলেন ঐতিহাসিক কেবল অতীত কাহিনীর কথক, তাঁরা সবটুকু বলেন না। আজ আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হল ঐতিহাসিক ভবিষ্যতেরও গণক। প্রমথবাবু আগেভাগেই বুঝতে পেরেছিলেন আমাদের সম্ভাব্য দুর্গতির কথা। ঐন্দ্রজালিকের ঝুলির মতো তাঁর হাঁড়ি থেকে একে একে বেরুতে লাগল রকমারি খাবার—বিশুদ্ধ গব্যঘৃতের ফুলকো লুচি, অতুলনীয় আলুর দম (আহা! স্বাদটুকু যেন এখনও লেগে আছে মুখে)···তৃতীয় পাত্র থেকে যা বেরুল তার চেহারা দেখেই আমাদের চক্ষুস্থির। মরি মরি! এমন উপাদেয় মোহনভোগ কতোকাল দেখিনি। কোথায় একখণ্ড শুকনো পাঁউরুটি চিবিয়ে সায়মাশ সারব ভেবেছিলুম, আর তার পরিবর্তে কিনা এমন অপূর্ব ভূরিভোজ! জয়তু প্রমথবাবু! এরপরে যখনই যেখানে যাব আপনারই চরণে শরণ নেব! এক নয়, দুই নয়, আমরা এগারো জন অধ্যাপক; অধ্যাপক তো নয়, একাদশ রুদ্রের তৃপ্তি বিধান করলেন প্রমথবাবু।

রেলগাড়ি কী কঠিন, অথচ কী সহিষ্ণু মমতাময়ী। শীতের রাতে শত শত মাইল দৌড়ে চলেছে লৌহবর্ত্মের ওপর দিয়ে, আর আমরা কেমন মজা করে সার্সি এঁটে সর্বাঙ্গে গরম জামা কাপড় জড়িয়ে গুলতানি করতে করতে সুলতানের মতো চলেছি। যদি রেলগাড়িখানা মানুষের এই নিষ্ঠুর স্বার্থপরতায় ক্রুদ্ধ হয়ে মুহূর্তের জন্য লাইন ছেড়ে বাইরে চলে যায়—হরিব্‌ল্‌ হরিব্‌ল্‌! ভগবান করুন, আমরা যেন বহাল তবিয়তে ফিরে গিয়ে বঙ্গবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারি।

ট্রেনে আলাপ জমিয়েছিলেন বাঙ্গাল অধ্যাপক সুশীল রায়-চৌধুরী। বিশুদ্ধ পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় গাল-গল্প-কাহিনী—চুটকি ও ছড়ার যেন ফোয়ারা বয়ে চলেছে। সৎ-সাহিত্যের বাইরে যে বিপুল অলিখিত সাহিত্য গড়ে উঠেছে লোকের মুখে মুখে, রায়-চৌধুরী যেন তারই বিশ্বকোষ। রেলপথে এমন সহযাত্রী পেলে সময়টা কাটে ভালো।

আমার সখ হল অবাঙালি ভদ্রলোকদের সঙ্গে একটু আলাপ করি। পাশের ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলুম—নিঙ্গল্‌ এবিডে তামসিকুন্নো? ভদ্রলোক অপ্রস্তুত হয়ে হিন্দীতে বললেন—আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলুম না মশাই। আপনি আমাকে দক্ষিণ ভারতের লোক ভেবেছেন। কিন্তু আমি তা নই।

—তবে কী আপনি?

—গুজরাতি।

পরিচয়ে জানা গেল ভদ্রলোক কলকাতার ব্যবসায়ী, সেই ব্যবসায়ের সূত্রেই যাচ্ছেন মাদ্রাজ। থাকেন ভবানীপুরে।

আমেদাবাদ থেকে কলকাতায় এসেছেন খুব বেশিদিন হয়নি। ইংরেজি জানেন সামান্য, বাংলাটাও ঠিক রপ্ত হয়নি। সুতরাং হিন্দীতেই আমাদের বাতচিত হল। জয় হোক রাষ্ট্রভাষার।

তারপর আলাপ হল স্যুট পরিহিত কৃষ্ণকায় যুবকের সঙ্গে। ন্যাশনালিটি বোঝা গেল না। যাকগে, স্যুট যখন পরেছে, ইংরেজি নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু স্বাধীনতালাভের দশ বছর পরেও একজন ভারতীয় আর একজন ভারতীয়ের সঙ্গে ইংরেজিতে বার্তালাপ করবে? উঁহু, মন সায় দিচ্ছে না। তাই রাষ্ট্রভাষার শরণাপন্ন হলাম। কিন্তু রাষ্ট্রভাষায় ভদ্রলোকের ব্যুৎপত্তি দেখে সন্দেহ হল ইনি দক্ষিণ ভারতের লোক এবং দু-চার কথা হতে না হতেই জানা গেল ইনি খাস কেরালার অধিবাসী। কী আশ্চর্য! সে কথা আগে বলতে হয়। কী নাম, কী বা ধাম, কোথা হতে আগমন, কোথায় গমন ইত্যাদি ভদ্রতাসূচক প্রশ্নোত্তর মলয়ালম ভাষাতেই সম্পন্ন হল। আমার ভ্রমণ-সঙ্গী ছিল একখানি গীতাঞ্জলি। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্জলির মলয়ালম অনুবাদ। স্থানে স্থানে বুঝে নিলুম মলয়ালি ভদ্রলোকের কাছে।

কামরায় মহিলাযাত্রী ছিলেন মাত্র একজন এবং তিনিও মদ্রকন্যা। ভদ্রমহিলা বর্ষীয়সী—পঞ্চাশ পেরিয়েছে—কিন্তু বয়সের ছাপ মুখে চোখে এখনও ততোটা পড়েনি। তাঁর সহযাত্রী ততোধিক বর্ষীয়ান জনৈক মাদ্রাজি। এঁরা দুজনে তামিল ভাষায় কী সব বলাবলি করছিলেন, (বোধ করি আমাদের সংখ্যাধিক্যে তাঁদের অসুবিধার কথা) যার এক বর্ণ বোঝাও আমাদের দুঃসাধ্য ছিল। ভদ্রমহিলা বেশ শিক্ষিত বলেই মনে হল কিন্তু ভদ্রলোককে ঠিক মার্জিত মনে হয়নি। পরে আলাপ করে জানতে পেলুম আমাদের অনুমানই ঠিক। ভদ্রলোক তামিল ছাড়া দ্বিতীয় ভাষা জানেন না, কিন্তু ভদ্রমহিলা সুনীতি চাটুজ্জের স্ত্রী-সংস্করণ। জন্ম

ও শিক্ষা বেনারসে, সুতরাং হিন্দী তাঁর ভালোই জানা আছে। তারপরে কাটান ত্রিবান্দ্রাম-এ, সেই সূত্রে মলয়ালমও জানেন। তামিল তাঁর মাতৃভাষা। বর্তমানে উনিশ বছর ধরে আছেন কলকাতায়, লেক মার্কেটের কাছেই। সুতরাং বাংলা যে জানবেন তাতে আর আশ্চর্য কী? আমাদের কথাবার্তা বাংলাতেই হচ্ছিল।

এতোক্ষণ অধ্যাপকগোষ্ঠীর ধারণা ছিল অবাঙালিরা তো কেউ আর বাংলা জানেন না, সুতরাং নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় কিঞ্চিৎ রস-চর্চা করা যাক। কী সর্বনাশ! এই ভদ্রমহিলা বাংলা জানেন শুনে এবং বাংলা ভাষায় তাঁর স্বাভাবিক দখল দেখে সকলেই শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

রাত বেড়ে চলেছে। আমাদের উৎসাহের বন্যায় ভাঁটা পড়ল। ক্রমে ক্রমে কোলাহলকে ছাপিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল লৌহচক্রের বিচিত্র আবর্তন-ধ্বনি। আমরাও বিচিত্র দেহ-ভঙ্গিমায় নিদ্রাদেবীর কোলে আত্মসমর্পণ করলুম।

রাত্রের গভীর অন্ধকারে কোথা দিয়ে যে উড়িষ্যা পার হয়ে এলুম জানি না। যে চিল্কার এতো নাম শুনেছি দেখা হল না সেই অপূর্ব জলসম্ভার।

এসে পৌঁছলুম অনার্যভূমিতে। কবি গেয়েছেন—দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ। কিন্তু আমরা ঠিক বিপরীতক্রমে বঙ্গ থেকে যাত্রা করে উৎকল পেরিয়ে তবে এসে 'পদার্পণ' করলুম দ্রাবিড় দেশে। স্টেশনের নামে শোভা পাচ্ছে তেলুগু হরফ, সঙ্গে ইংরেজি ও রাষ্ট্রভাষাও আছে।

নতুন রাষ্ট্র অন্ধ্র। এতদিন সে বৃহত্তর মাদ্রাজ রাষ্ট্রের মধ্যেই

আত্মগোপন করে ছিল। বহু আন্দোলনের পরে হায়দরাবাদকে নিয়ে গঠিত হল নতুন তেলুগু-ভাষী প্রদেশ। অন্ধ্রের বুকের উপর দিয়ে যেতে যেতে রোমাঞ্চিত দেহে স্মরণ করি রামুলুর আত্মাহুতিকে।

ইচ্ছাপুরম, নৌপাদা, বিজয়নগরম, সীমাচলম, সমলকোট—ছায়াছবির মতো একে একে মিলিয়ে যায় অন্ধ্রের ছোট ছোট পাহাড়-ঘেরা বিচিত্র জনপদ। সকাল থেকে সন্ধ্যা। কখনও অলস চোখে, কখনও কৌতূহল-ভরা দৃষ্টিতে—দেখার আর বিরাম নেই। ঝাড়ুপুড়ু, সম্পেটা, শ্রীককুলম, পুণ্ডুরু, কোরুকোণ্ডা—নামগুলি আমাদের কাছে অদ্ভুত ও নিরর্থক মনে হলেও স্থানীয় অধিবাসীদের চোখে ওগুলি ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রাম—সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না মাখানো স্নেহময়ী পল্লিজননী।

রাত তখনও গভীর হয়নি। নৈশ ভোজনের পরে তন্দ্রা জড়ানো চোখে একটু অনুভব করছিলাম ভ্রমণের আনন্দ। গাড়ির শব্দ থেকে বোঝা গেল আমরা কোনো ব্রিজের উপর দিয়ে চলেছি। হঠাৎ কে উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠল-—গোদাবরী, গোদাবরী। ব্রাহ্মণ অধ্যাপক প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে আবেগভরা কণ্ঠে মার্জিত ভঙ্গিতে আবৃত্তি শুরু করে দিলেন: ওঁ গঙ্গে চ যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতি……। নশো মাইল দীর্ঘ দক্ষিণ ভারতের এই বৃহত্তম নদী কতো স্মৃতি বহন করে নিয়ে আসছে—পঞ্চবটী বনে রাম-সীতার স্মৃতি বিজড়িত এই গোদাবরী। স্কুলের সংস্কৃত পণ্ডিত মহাশয়ের কথা মনে হলেই আমার মনে পড়ে—অস্তি গোদাবরী তীরে বিশালঃ শাল্মলীতরুঃ। সেই গোদাবরী। চোখ ভরে দেখে নিলুম গোদাবরীকে—বিরাট বিস্তৃত নদী—দাক্ষিণাত্যের গঙ্গা।

হাওড়া টু মাড্রাস—চল্লিশ ঘণ্টার যাত্রাপথে প্রায় চব্বিশ

ঘণ্টাই কাটাতে হয় অন্ধ্র প্রদেশে। এক সূর্যোদয় থেকে আর এক সূর্যোদয়। রাজপুত্রের মতো ঘুম থেকে জেগেই দেখি—এসেছি এ কোন দেশে! স্টেশনে স্টেশনে তেলুগু সরে গিয়ে এবারে দেখা দিয়েছে তামিল হরফ। আর অন্ধ্র নয়, তামিলনাড অর্থাৎ খাস মাদ্রাজ রাষ্ট্রে এসে পড়েছি আমরা। মাদ্রাজ শহরের আর বাকি নেই। বেলা নটায় পৌঁছনো গেল মদ্‌রাস্—ওরা যাকে বলে চেন্নাই।

ও হরি! এই মাদ্রাজ? ইজ দিস ইআরো? মাদ্রাজের প্রসন্ন প্রভাত আমাদের সাদরে বরণ করে নিল। চমৎকার নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া, যদিও সময়টা ডিসেম্বরের শেষ।

মাদ্রাজের সঙ্গে শুভদৃষ্টি হতে না হতেই তাকে ছেড়ে যেতে হবে। সাত দিনের ভ্রমণ-সূচী আগে থেকেই তৈরি—নড়চড় হবার উপায় নেই। আজই সন্ধ্যা ৭টায় আমরা রওনা হচ্ছি তিরুচি অর্থাৎ ত্রিচিনপল্লির অভিমুখে।

সুতরাং যেটুকু সময় হাতে আছে খুব ঘোরা যাক। ট্যাক্সি নিয়ে শহর ও সমুদ্রতীর ঘুরে দেখা গেল। সমুদ্র যদিও খুব নিকটে নয়, তবু স্ট্র্যাণ্ড রোডটি (মেরিনা) বড় সুন্দর। মনে পড়ল কলকাতার স্ট্র্যাণ্ড রোডের কথা। মাদ্রাজ শহরে যে এককালে ট্রাম চলাচল করত তার নিদর্শন ট্রাম লাইন এখনও পড়ে রয়েছে, কিন্তু ট্রাম নেই। ঐ ট্রাম লাইনের দিকে তাকিয়ে মনে হল ও যেন বলছে—স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি, ভারমুক্ত সে এখানে নেই।

মাদ্রাজ কলকাতার মতো জনবহুল শহর নয়। জনসংখ্যার দিক থেকে যদি বিচার করা যায় তবে কলকাতার কাছে মাদ্রাজ একেবারে দুগ্ধপোষ্য শিশু। সারা শহরে টহল দিলুম, কিন্তু মানুষ কই? আমরা চিৎপুর বড়বাজারের লোক, বৈঠকখানার

বাজার আমাদের তীর্থক্ষেত্র, পৃথিবীর অদ্বিতীয় মোড় হ্যারিসন-সার্কুলার-বৌবাজার-ক্রসিং আমাদেরই কলকাতায়। ফুঃ, আমাদের কাছে মাদ্রাজ আবার নগরী।

দুপুরে খাওয়া হল দরবার রেষ্টুরেন্ট-এ। মুসলমান পরিচালিত হোটেল। মাছ-মাংস পাওয়া গেল বটে, কিন্তু এখানেও দেখছি মাদ্রাজি খাদ্যের সেই বিশিষ্ট গন্ধটি যা সহজেই বঙ্গ-সন্তানকে বিবমিষু করে তোলে। মাদ্রাজি গানা আর মাদ্রাজি খানা, একটি পদেই হয় পরিচয় জানা। পাশেই ছিল ব্রাহ্মণ হোটেল 'গণেশভবন।' আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সেখানেই গেলেন। বিশুদ্ধ নিরামিষ খাওয়া—সরু আতপ চালের ভাত, ঘি, ডাল ও ভেজিটেবল। নগদ মূল্য মাত্র ছ-আনা।

বন্দরের কাল হল শেষ। দীর্ঘ ৪০ ঘণ্টা একটানা রেল ভ্রমণের পরে একটু বিশ্রাম করছিলুম। কিন্তু তাগিদ এল—তইয়ার হো জাও। মাদ্রাজের এগমোর স্টেশন থেকে (এ যেন আমাদের শিয়ালদহ স্টেশন) 'ধনুকোডি বোট মেল' ধরতে হবে। জলদি জলদি। অটো-রিক্সায় মালপত্র চাপিয়ে চল স্টেশন।

শাস্ত্রে বলেছে, লোভান্নাশো প্রজায়তে। গাড়ি ছাড়ার তখনও বাকি আছে। বন্ধুবর অধ্যাপক নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় হাতে একটি প্যাকেট নিয়ে দিগ্বিজয়ীর ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছেন। এবারে আর প্রমথবাবু সঙ্গে নেই, তিনি ভিন্ন পথের যাত্রী। সুতরাং খানা-পিনার ব্যবস্থা নিজের হাতেই করতে হবে। নলিনীবাবুর প্যাকেটটি দেখে ভয়ানক লোভ হল। এত্তো বড়ো একটা প্যাকেট ভরা খাবারের দাম মাত্র তিন আনা। ইংরেজি

হরফে প্যাকেটের গায়ে লেখা আছে—সম্বর সাদম। হাতে নিয়ে দেখলুম বেশ গরম। বাঃ এতো সস্তায় রাতের খাওয়া চুকে যাবে। কিনে ফেললুম আমিও একটা। তখনও জানতে অনেক বাকি ছিল।

এগমোর থেকে গাড়ি ছাড়ল সন্ধ্যা ৭টায়। এবারে আর সংরক্ষিত আসন নয়। আমরা বিদেশী যাত্রী একটু পূর্বেই এসে উঠেছিলুম। গাড়ি ছাড়ার পড়ে দেখা গেল সকলেই মাদ্রাজি। খাস তালিমনাড়ের বুকের উপর দিয়ে চলেছি। অন্ধ্র বা কেরালার লোক একটিও নেই। সহযাত্রীরা সকলেই বিশুদ্ধ তামিলিয়ান। এরা না জানে হিন্দী, না বলে ইংরেজি।

গাড়ি ছাড়ার ত্ব-এক মিনিট থাকতে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন জনৈক প্রৌঢ় ব্যক্তি। চেহারা থেকে ভদ্র শিক্ষিত বলেই মনে হল। জায়গা ছেড়ে বসতে দিলুম। আলাপ হল ইংরেজিতে। নাম গোপালস্বামী আয়ার। পেশা ডাক্তারি। কলকাতায় কখনও যাননি। বাংলা বা হিন্দী কোনটাই জানা নেই। ভদ্রলোকের বাড়ি তাঞ্জোর জেলার কুম্ভকোনম শহরে। আমাদের ভ্রমণ-সূচীতে কুম্ভকোনম নেই শুনে আক্ষেপের স্বুরে বললেন—তাঞ্জোর যদিও জেলার সদর, মন্দির ও স্থাপত্যরীতির দিক থেকে কুম্ভকোনম-এর গুরুত্ব ঢের বেশি। এবারে হল না বটে, কিন্তু আবার যখন আসবেন আমার কুটিরে অবশ্যই পদার্পণ করবেন। (কলকাতায় ফিরে এসে গোপালস্বামীর পত্র পেয়েছি এবং তামিল শিক্ষার কয়েকখানি বইপত্র তিনি অযাচিতভাবেই আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।)

কামরার মধ্যে থেকে কে একসময় বলে উঠল—আপলোগ কাহাঁ সে আতে হ্যাঁয় ? এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, কে বাপু এই পাণ্ডব বর্জিত দেশে (আমার মতে হিন্দী জানা লোকই বর্তমান

যুগের পাণ্ডব) হিন্দী বলে ? শুনে মনে হল মাতৃভাষাই শুনছি। আলাপ জমল দূর থেকেই। গাড়িশুদ্ধ লোক এই দুর্বোধ্য ভাষায় আলাপ শুনে আমাদের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। হিন্দী জানা লোকটি তামিলিয়ান, সম্প্রতি যাচ্ছে সিংহলে। বুঝেছে আমরা বাঙালি এবং কলকাতা থেকে এসেছি। কী করে বুঝল তাও সে জানাল। আন্দামানে যে অফিসারবাবুর সঙ্গে সে কাজ করে তিনি বাঙালি এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের চেহারা ও কথাবার্তার সাজাত্য তার দৃষ্টি এড়ায় নি।

রাত কম হয়নি, এদিকে খিদেও পেয়েছে প্রচুর। এবাবে সেই প্যাকেটজাত দ্রব্যের সদ্ব্যবহার করা যাক। কিন্তু প্যাকেট খুলেই আমার চক্ষুস্থির। ডাল ও ভাত মিশিয়ে একটা পদার্থ আর কি! খানিকটা তুলে মুখে দিতেই বমি এসে গেল। গোপালস্বামীকে বললাম—কিছু মনে করবেন না স্যার। এখনও আপনাদের খাদ্যে অভ্যস্ত হইনি। অতঃপর এক গ্লাস জল খেয়ে নিদ্রার উদ্যোগ করা গেল।

রাত বেড়েই চলেছে। একে একে অনেকেই নেমে গেল। গোপালস্বামী নেমে গেলেন, নেমে গেল সেই হিন্দী জানা তামিলিয়ান ছোকরা। মধ্যে মধ্যে স্টেশন থেকে নরনারী উঠছে নামছে—এরা বোধ করি দূরপাল্লার যাত্রী নয়। গভীর রাত, কারও সঙ্গে বিশেষ বার্তালাপ নেই। ভোর রাতে এসে পৌঁছলুম তিরুচি—তিরুচ্চিরাপল্লি অর্থাৎ ত্রিচিনপল্লি।

ত্রিচিনপল্লি—সুন্দর স্টেশন ও প্ল্যাটফর্ম। ততোধিক সুন্দর স্টেশনের সামনেকার প্রশস্ত অঙ্গন। কাছেই বিখ্যাত হোটেল অশোক ভবন, ঠাঁই পেয়ে গেলুম সেখানে। সারা সকাল ট্যাক্সি নিয়ে ত্রিচিনপল্লি এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ঘুরে বেড়ালুম, অনেক মঠমন্দির দেখা হল, কিন্তু সবচেয়ে বেশি মনে থাকবে

তিরুচি রক টেম্পল (Rock-Temple.) গিরিমন্দিরের সুউচ্চ চূড়া থেকে কাবেরী নদীর প্রবহমাণ ধারা দেখে ভ্রমণেয় সমস্ত ক্লান্তি জুড়িয়ে গেল।

বস্তুত এই কাবেরী নদীই দ্রাবিড় সভ্যতার প্রাণধারা। উত্তর ভারতের আর্য সংস্কৃতিকে যদি বলা যায় গাঙ্গেয় সংস্কৃতি, তবে দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়ি সংস্কৃতির নাম হোক কাবেরী সংস্কৃতি। ব্রাহ্মণের আচমন মন্ত্রের সূচনায় গঙ্গা, অন্তে কাবেরী। গঙ্গার দেশে কাশী, কাবেরীর দেশে কাঞ্চী। গঙ্গার তীরে হরিদ্বার-কানপুর-বারাণসী-পাটনা-মুঙ্গের, কাবেরীর তীরে ইরোদ-তিরুচি-তাঞ্জোর-কুম্ভকোনম-মায়াভরম।

বাল্যের মুখস্থ করা দাক্ষিণাত্যের সেই রাজবংশগুলির কথা মনে পড়ে—চের-চোল-পাণ্ড্য-পল্লব? আপাতত আমরা এসে পড়েছি চোলরাজাদের দেশে। তাঞ্জোর-ত্রিচিনপল্লির বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে আছে তাঁদের স্মরণীয় কীর্তি।

দশম শতাব্দী থেকে এঁদের রাজ্যবিস্তারের সূচনা। উত্তরে কলিঙ্গ, দক্ষিণে সিংহল—এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন রাজরাজ চোল। তারপরে এলেন যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র—সুপ্রসিদ্ধ রাজেন্দ্র চোল। চোল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। ভারতের দিগ্বিজয়ী নরপতিদের শীর্ষস্থানীয়।

ফর ফর করে উড়ে গেল ইতিহাসের অনেকগুলি পৃষ্ঠা।

একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। কলিঙ্গ জয় করে গঙ্গার তীরে এসে উপনীত হলেন দিগবিজয়ী চোল সম্রাট। পশ্চিম বঙ্গের মহীপাল ও পূর্ববঙ্গের গোবিন্দচন্দ্রকে পরাভূত করে তিনি

নতুন উপাধি গ্রহণ করেন—গঙ্গইকোণ্ড (গঙ্গা বিজয়ী) রাজেন্দ্র চোল। এই ত্রিচিনপল্লি জেলায় স্থাপিত হয় তাঁর নতুন রাজধানী গঙ্গইকোণ্ড চোলপুরম্।

রাজেন্দ্র চোলের পরবর্তী জীবন আরও মহিমান্বিত। ভারতের বাইরে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হল তাঁর আধিপত্য। ব্রহ্ম, মার্তাবান, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, মালয়, সুমাত্রা, বালিদ্বীপ, যবদ্বীপ —এক একটি করে নাম যুক্ত হতে থাকে চোল বংশের সাম্রাজ্যে আর এক এক ধাপ এগিয়ে যায় ভারতের রাষ্ট্রগৌরব। হিন্দুস্থানের ইতিহাসে সে এক স্বর্ণযুগ।

তিরুচির গিরিমন্দিরের শিখরে দাঁড়িয়ে মনে হল—আমিই বুঝি সেই মহামহিমান্বিত পরম ভট্টারক গঙ্গইকোণ্ড রাজেন্দ্র চোল। জলযান ভাসিয়ে সমুদ্রে চলেছে আমার বিপুল নৌবাহিনী। মুকুটমণ্ডিত উন্নত শির, হস্তে ধনুর্বাণ—নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি অকূল সমুদ্রের দিগন্তে। দূরে—বহুদূরে ভেসে উঠল সবুজ বনরাজির ক্ষীণরেখা—যেন আমার নব-নায়িকার সলজ্জ অবগুণ্ঠন। তারপরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আরও নিবিড় করে দেখলুম সেই রমণীকে। শিথিলবসনা সদ্যস্নাতা দ্বীপকন্যা। চোখে বনহরিণীর সরল মুগ্ধ দৃষ্টি।

আর আমি? বিংশ শতকের বাঙ্গালি কবিকণ্ঠেই শুনুন—

মকরচূড় মুকুটখানি পরি' ললাট 'পরে
ধনুকবাণ ধরি' দখিন করে,
দাঁড়ানু রাজবেশী,
কহিনু, 'আমি এসেছি পরদেশী।'

সে রাজেন্দ্র চোলও নেই, সে ত্রিচিনপল্লিও আর নেই। শহরে ঘুরেপুরে খুব শ্রদ্ধা বাড়ল না। এই কি সেই তিরুচি—যার বিজয়পতাকা একদা উড্ডীন ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে? কিন্তু তার চিহ্নমাত্রও আজ আর অবশিষ্ট নেই তো! হাটে বাজারে সর্বত্রই দেখছি এখানকার মুক্তকচ্ছ মানুষগুলি কেমন অলস নিশ্চিন্ত মনে কফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে। আর হোটেলে মন্দিরে দক্ষিণা গুনছে মুণ্ডিতশির নগ্নপদ ব্রাহ্মণের দল! কালস্য কুটিলা গতিঃ।

গিরিমন্দিরের পাদদেশেই একটি বৃহৎ সরোবর। সরোবরের ওপারে ঐ বাড়িটি দেখছেন—ঐ যে দক্ষিণ-পূর্ব কোণের বাড়িটি? আজ ওটি সামান্য বাড়ি বটে, কিন্তু এককালে—ধরুন দুশো বছর আগে—ওখানে বসবাস করতেন সেই ধুরন্ধর ইংরেজ—ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের যিনি প্রথম স্থপতি। পলাশীর প্রান্তরে ভাগ্য-পরীক্ষার তখনও কিছু বাকি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সেই ছোকরা কেরানি কলম ছেড়ে কেবল তলোয়ার ধরতে শিখেছে আর ফরাসি-ইংরেজে মিলে আর্কট নিয়ে মর্কটযুদ্ধ চলছে। এ সব হল সেই সময়কার কথা। আর আজ? লর্ড ক্লাইভের বাড়ির সামনে ঝুলছে দাতব্য চিকিৎসালয়ের বিবর্ণ সাইনবোর্ড। কালস্য কুটিলা গতিঃ।

ট্যাক্সি চলল শ্রীরঙ্গম-এর দিকে। তিরুচির সহরতলি শ্রীরঙ্গম। চতুর্দিকে কাবেরীর ধারা—একটি চমৎকার দ্বীপ। মন্দিরটি আরও চমৎকার। শোনা যায় দশম থেকে ষোড়শ শতাব্দী—এই সুদীর্ঘকাল ধরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে ভারতের এই বৃহত্তম

মন্দির। চোল রাজবংশ ছিল শৈব, তবু যে তাদের নাকের ডগায় এতো বড়ো একটা বৈষ্ণব মন্দির প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে, তার থেকে বোঝা যায়—ধর্ম সম্পর্কে রাজন্যবর্গ ছিলেন উদারপন্থী।

চোখের সামনে গগনস্পর্শী গোপুরম। বিস্মিত নয়নে চেয়ে আছি। দর্শনার্থীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। কিন্তু বিশাল মন্দিরের তুলনায় তা নিতান্তই সামান্য। জনতা আছে, কিন্তু ভিড় নেই। পাণ্ডারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে আর সত্য মিথ্যা মিলিয়ে নানা অলৌকিক কিংবদন্তী দিয়ে পুণ্যার্থীর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করছে।

ওরই মধ্যে এক সময়ে আলাপ হয়ে গেল জনৈক ভক্ত তামিলিয়ানের সঙ্গে—নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী। শ্রীরঙ্গম-এর অধিবাসী। বেশ আর্যসুলভ চেহারা। গৌরবর্ণ গোলগাল নধরকান্তি, যেন নবদ্বীপের গোঁসাঈজি।

মন্দিরের প্রশস্ত অঙ্গনে দাঁড়িয়ে আমি হিসেব লাগাবার চেষ্টা করছি না—কতো টন ইট-কাঠ- লোহা-লক্কর প্রয়োজন হয়েছিল এর গঠনকার্যে। আমি অনুভব করবার চেষ্টা করছি—সুদূর অতীতে একদিন রামানুজ স্বামী এসে দাঁড়িয়েছিলেন এই মন্দির প্রাঙ্গণে। আমি অনুভব করবার চেষ্টা করছি—একদিন বৈষ্ণব আলোয়ারদের সুমধুর কণ্ঠে মন্ত্রিত হয়েছিল এর গোপুরম। আমার মনে আসছে আণ্ডালের কথা—দক্ষিণের মীরাবাঈ আণ্ডাল।

আণ্ডাল—তামিল ভক্তি-সাহিত্যের একটি স্মরণীয় নাম। গোপীদের কৃষ্ণপ্রেম নিয়ে রচিত তাঁর ত্রিশটি স্তবকের কাব্য "থিরুপ্পাবাঈ" বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অতি সমাদরের বস্তু। স্বয়ং রামানুজ নাকি ভিক্ষায় বেরুতেন আণ্ডালের সঙ্গীত কণ্ঠে নিয়ে। আজও দাক্ষিণাত্যের মানুষ মার্গালি (অগ্রহায়ণ) মাসে বিশেষ ভাবে স্মরণ করে এই ভক্ত কবয়িত্রীকে।

দাক্ষিণাত্যের আণ্ডাল, উত্তরাপথের মীরাবাঈ। মীরা গেয়েছিল—মেরে তো গির্ধর্ গোপাল দূসরো ন কোঈ। গির্ধর্লালই ছিল মীরার কৃষ্ণ, তাঁর স্বামী। আণ্ডালের কৃষ্ণ শ্রীরঙ্গম-এর এই রঙ্গনাথ।

—বুঝলে মিস্টর বটাচারিয়া, মীরাবাঈর লৌকিক স্বামী ছিল উদয়পুরের রাজকুমার। আণ্ডালের কিন্তু শাস্ত্রমতে বিয়ে হয় এই রঙ্গনাথের সঙ্গে। সে সব আশ্চর্য কাহিনী। একই রাতে রঙ্গনাথ স্বপ্নাদেশ দিলেন আণ্ডালের পিতা এবং মন্দিরের প্রধান পুরোহিতকে। দৈব সমারোহে বৈষ্ণব কন্যাকে নিয়ে আসা হল এই মন্দিরে। সেদিনকার উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দেখল পাথরের মূর্তি রঙ্গনাথ হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করতেই আণ্ডাল মিলিয়ে গেল তাঁর দিব্য দেহে—আবেশমুগ্ধ কণ্ঠে নীলকণ্ঠ বলে গেলেন।

হয়তো গল্প। কিন্তু ভক্তিপূত চিত্তে অবিশ্বাস্য কিছুই নেই। অন্তত শাস্ত্রীজি বিশ্বাস করেন সে কথা। মীরার পদাবলি শুনতে শুনতে ভক্তের চোখে অশ্রু ভরে আসে। বসো মেরে ন্যায়ন মেঁ নন্দলালা। শাস্ত্রীজির চোখও বোধ করি সজল হয়ে উঠেছিল যখন ভক্ত সাধক গাইছিলেন—কুরেই ওণ্ডু মিল্লাদ গোবিন্দা··· হে গোবিন্দ, হে সর্বপাপবিরহিত গোবিন্দ, ভালোবেসে তোমায় আমি কতো নামেই ডেকেছি।

ষোড়শ শতাব্দীর উত্তরাপথ মুগ্ধ হয়েছিল একটি নারীকণ্ঠের মাধুর্যে—চারশো বছর পরেও যার গানের রেশ থামেনি। আর, হাজার বছর আগে দাক্ষিণাত্যে বেজে উঠেছিল তেমনি এক মধুর কণ্ঠ—আজও বয়ে চলেছে যার গানের অমৃতধারা।

রঙ্গনাথকে প্রণাম জানিয়ে ফিরতি পথে নাবলুম কাবেরী নদীর ঘাটে। গিরিমন্দিরের উচ্চ চূড়া থেকে যে রজতধারাকে দেখেছিলুম, এই কি সেই কাবেরী? চিত্রার্পিত নদী এতোক্ষণে বুঝি জীবন্ত হয়ে উঠল। শ্রীরঙ্গম-এর কাবেরী যেন কাটোয়ার গঙ্গা, বিস্তীর্ণ বালুশয্যার একপাশে অগভীর জলের খরস্রোত।

শাস্ত্রীজি কিন্তু সঙ্গ ছাড়েননি। প্রশংসনীয় তাঁর দেশাত্মবোধ। অপরিচিত যাত্রীকে নিজের দেশের সব কথা জানাবার অফুরন্ত আগ্রহ তাঁর। বন্ধুরা সব নেমেছেন পুণ্যতোয়া কাবেরীর জলে। আর পাপাত্মা আমি নীলকণ্ঠের দ্রাবিড়ি ইংরেজি এবং অনর্গল উচ্চারিত দুর্বোধ্য তামিল অনুধাবনের বৃথা চেষ্টা করছি।

—আরু ইরণ্ডুম কাবিরী, অদন নড়ুবে শ্রীরঙ্গম। প্রথমেই শাস্ত্রীজি শুনিয়ে দিলেন তামিলনাড়ুর এই প্রচলিত বাক্য—দু-ধারে বহিছে কাবেরীর ধারা মধ্যে শ্রীরঙ্গম। বোঝা গেল, কাবেরী এঁদের খুবই প্রিয় নদী।

—আচ্ছা শাস্ত্রীজি, প্রাচীন তামিল সাহিত্যে কাবেরীর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় কি?

—পাওয়া যায় মানে? ওয়াট্ ডু সে, ম্যান?—নীলকণ্ঠের কণ্ঠ গড় গড় করে উঠল। এক নাগাড়ে তিনি শোনাতে লাগলেন তামিল কাব্যের আবৃত্তি, অবশ্য সটীক ও সানুবাদ। তবু 'শন্নোঃ আপো ধন্বন্যা'র চেয়ে তা কিছুমাত্র সুবোধ্য হল না—

উড়বরোদৈ মদকোদৈ য়ুডেন্নীরোদৈ তন্‌পদঙ্গোল্‌
বিলবরোদৈ চিরন্‌দার্‌প নটন্দায় বালী কাবিরী…

যেন ঠক ঠক করে কেউ পেরেক ঠুকে দিচ্ছে আমার কানে।

অথচ, শাস্ত্রীজি বললেন, উদ্ধৃত পদ্যাংশটি একটি গান—নায়ক কোবলন জ্যোৎস্নাসুরভিত রাতে কাবেরী নদীর মোহনায় বসে গেয়ে শোনাচ্ছে নায়িকা মাধবীকে। কতোকালের পুরোনো কাব্য —'সিলপ্পধিকারম', কিন্তু আজও তার নায়ক-নায়িকার কথা ওরা ভোলেনি।

তামিল সাহিত্যের একটি বড়ো নাম হল দ্বাদশ শতাব্দীর কম্বন। হিন্দী সাহিত্যে যেমন তুলসীদাস, বাংলা সাহিত্যে যেমন—না, ঠিক তেমন নাম নেই আমাদের সাহিত্যে। কম্বন জন্মেছিলেন এই কাবেরী নদীর তীরে। তাই রামায়ণে সরযূর বর্ণনা দিতে গিয়ে বারবার তাঁর মনে জেগেছে কাবেরী নদীর ধারা। আসলে কাবেরীর মধ্যেই কম্বন খুঁজে পেয়েছিলেন অযোধ্যার সরযূকে।

নীলকণ্ঠের কণ্ঠ আর থামে না। উঠতি গায়ক যেমন, একখানা গানের অনুরোধ পেলে দশখানা শুনিয়ে দেয়, তরুণ সাহিত্য-রসিক যেমন কোনো একটি সূত্র পেলেই হুইটম্যান থেকে কামু-পেস্টারনাক পর্যন্ত এনে ফেলে, নীলকণ্ঠের উৎসাহও তেমনি অপরিসীম। গ্রীষ্মের কাবেরী, বর্ষার কাবেরী, শীতের কাবেরী—কাবেরী মাহাত্ম্য বর্ণনায় প্রাচীন তামিল সাহিত্য মন্থন শুরু করে দিলেন শাস্ত্রীজি। কিন্তু সে মন্থনজাত অমৃত আমার কাছে প্রায় হলাহল হয়ে উঠল। আমি তখন পালাবার পথ খুঁজছি। এমন সময়ে পুণ্যস্নান শেষ করে বন্ধুরা এসে উপস্থিত। আমিও পা বাড়ালুম ট্যাক্সির দিকে। গাড়ি ছাড়ার আগে বিদায় নিলুম শাস্ত্রীজির কাছে, আর কাবেরীর দিকে তাকিয়ে অপটু কণ্ঠে বললুম—

বিলবরোদৈ চিরন্‌দারপ নটন্দায় বালী কাবিরী।

দক্ষিণ ভারতের শেষ ভূখণ্ড সেতুবন্ধ-রামেশ্বরের যাত্রী আমরা। শাস্ত্রে বলেছে, হরিদ্বারের গঙ্গাজল নিয়ে এসে যদি রামেশ্বর মন্দিরের শিবের মাথায় ঢালা যায় তবে মুক্তি অনিবার্য। শাস্ত্র বচনের তাৎপর্য সুস্পষ্ট। ভারতের উত্তরতম প্রান্ত থেকে দক্ষিণতম প্রান্ত পর্যন্ত দেশ ভ্রমণের ফলে মনের যে প্রসার ঘটে তাই তো মুক্তি। আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের একদিকে হরদোয়ার, আরেক দিকে রামেশ্বরম।

মাদ্রাজ থেকে ধনুস্কোডির গাড়ি এল বোঝাই হয়ে। প্রচণ্ড ভিড়, ঠেলেঠুলে কোনোরকমে একটু জায়গা করে নেওয়া গেল। এ গাড়ির যাত্রীরা আর বিশুদ্ধ তামিলিয়ান নয়, এখানে ছত্রিশ জাতির মেলা। ভারতের দিগদিগন্ত থেকে শত শত যাত্রী চলেছে তীর্থ দর্শনে।

আজকের রাত বড়ো দুঃখেই কাটল। কষ্ট হচ্ছে প্রবীণ অধ্যাপক মণিভূষণ ভট্টাচার্যের অবস্থা দেখে। কিন্তু আপ্তবাক্য মনে হল, কষ্টকে বাদ দিয়ে কেষ্টকে তো পাওয়া যায় না।

ভোরের আলো সবে ফুটেছে। তন্দ্রালু চোখ মেলে একবার বাইরে তাকালুম। তন্দ্রা ছুটে গেল, রুক্ষ মেজাজ একমুহূর্তে স্নিগ্ধ হয়ে এল। আমরা যে সমুদ্রের কাছাকাছি এসে পড়েছি বাইরের প্রকৃতিতে তার পূর্ণ আভাস। মনে হল এখানে কিছু আগে বৃষ্টিও হয়ে গেছে। প্রকৃতির এক স্নিগ্ধ শ্যামল রূপ। সিকতাময় অঞ্চল, গাছপালা খুব বেশি নেই, চারিদিকে ছোটো ছোটো গুল্ম, উপরে মেঘমেদুর আকাশ, নিচে জলসিক্ত বালুভূমি। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে এসে পৌঁছলুম রামনাদ—রামনাথপুরম।

চের-চোল-পাণ্ড্য। চোলরাজ্যের সীমানা পেরিয়ে এসে পড়েছি পাণ্ড্যরাজ্যে। রামনাদ, মাদুরা ও টেনিভেলি—এই তিনটি জেলা নিয়ে গঠিত মাদ্রাজ রাষ্ট্রের দক্ষিণতম অংশ—তামিলনাড়ের পাণ্ড্যরাজ্য। চোলদের মতো পাণ্ড্যবংশও এককালে রাজত্ব করেছেন বিপুল গৌরবে। বহির্বাণিজ্যে পাণ্ড্যযুগ ছিল সবচেয়ে সেরা—চোলদের পরবর্তী যুগ। কবিগুরু সে-যুগের কথাও বলেছেন তাঁর 'সাগরিকা' কবিতায়।

· কখন এক সময়ে শুরু হল দক্ষিণ ভারতের রেলসেতু—পাম্বান ব্রিজ। রামেশ্বরম ও ধনুস্কোডি আসলে দ্বীপ—ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন। সমুদ্রের একাংশের উপরে এই সুদীর্ঘ রেলসেতু পার হতে গিয়ে যে বিচিত্র অনুভূতি জেগেছিল তাকে প্রকাশ করা যায় একমাত্র 'আনন্দে আতঙ্কে মিশি ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া মত্ত হাহারবে।' নিচে উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল রুষ্ট সমুদ্রের ক্রুদ্ধ গর্জন, উপরে সভ্যতা-গর্বিত বিজয়ী মানুষের মৃদু হাসি!

পাম্বান জংশন। বীর সন্ন্যাসীর স্মৃতিপূত এই ভূখণ্ড। ষাট বছর আগে পশ্চিম থেকে ফিরে এসে এখানেই প্রথম পদার্পণ করেন স্বামীজি তাঁর মাতৃভূমিতে। রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতি সেই শুভদিনের স্মরণে এই পাম্বানে নির্মাণ করেন চল্লিশ ফুট উঁচু একটি বিজয়-স্তম্ভ। বিশ্বের বিবেকানন্দকে বাঙালি বলে দাবি করলে তাঁকেই ছোটো করা হয় জানি, কিন্তু তবুও সেদিন বাঙালিয়ানার বড়াই করেছিলুম একথা স্মরণ করে—এই সন্ন্যাসী জন্মেছিলেন আমাদেরই বাংলা দেশে, মানুষ হয়েছিলেন আমাদেরই কলকাতায়।

অবশেষে এসে পৌঁছলুম রামেশ্বরম—বাল্যকাল থেকে কতো তীর্থযাত্রীর মুখে যার গল্প শুনেছি, সেই সেতুবন্ধ রামেশ্বরম। জগন্নাথ দেখিনি, দ্বারকা যাইনি, বদ্রিনাথ তো আরও দূরে।

বাকি থাকল রামেশ্বরম। ভারতের চতুর্ধামের অন্তত একটি ধামদর্শনের পুণ্য অর্জন করলুম আজ। আজ আমার জীবন-পঞ্জির একটি সার্থক ও স্মরণীয় দিন।

রাস্তাঘাট, দোকানপাট প্রভৃতির দিক থেকে রামেশ্বরম কিছুমাত্র উন্নত নয়, কিন্তু সমস্ত ক্ষতিপূরণ করে দিয়েছে এর অপূর্ব মন্দির। যে সকল তীর্থযাত্রী এখানে আসেন তাঁরা সকালের গাড়িতে পৌঁছে পূজার্চনা শেষ করে বিকেলের গাড়িতে চলে যান, কারণ মন্দির ছাড়া এখানে আর দ্রষ্টব্য কিছু নেই। এই সকল কারণেই এখানে নাগরিক সভ্যতা গড়ে ওঠার সুযোগ হয়নি। দ্বিপ্রাহরিক ভোজন রামেশ্বরেই সম্পন্ন হল। সেখান থেকে ধনুস্কোডি।

গাড়ি এসে দাঁড়াল ধনুস্কোডি পিয়র-এ। ইট-কাঠ ও লোহালক্কড় দিয়ে তটভাগ থেকে সমুদ্রের জলরাশির উপরে যে সেতু সম্প্রসারিত করা হয় তাকেই বলে পিয়র (pier)। পিয়র-এ পৌঁছবার আগে দূর থেকেই আমরা দেখতে পেলুম সিংহলগামী জাহাজ। মনের মধ্যে বিদ্যুত চমকাল—আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিল জয়, সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্যের পরিচয়। সেই সিংহলের, দশাননের দেশ লঙ্কার, বন্দরনায়ক-এর রাজ্য সিলোন-এর মুখোমুখি আমরা। বিদ্যুত চমকাবে বৈকি !

কলকাতা থেকে কতোদূরে আছি ? তা প্রায় দেড় হাজার মাইল। গাড়ি থেকে নেমে কিছুক্ষণের জন্য এসে দাঁড়ালুম সমুদ্র সৈকতে। কোথায় স্কট লেন, কোথায় অন্তবিহীন মহাসাগরের পার !

মাদ্রাস থেকে মাত্বরা। দক্ষিণ ভারতের পূর্ব উপকূল ধরে ধরে একেবারে সূচ্যগ্র-পরিমিত সমুদ্র-স্নাত ধনুস্কোডি, তারপর সেখান থেকে রেলপথে উজান বেয়ে বেয়ে সভ্যজগতের দিকে প্রত্যাবর্তন। রাত প্রায় ত্বটোর সময় এসে পৌঁছলুম ভারতবর্ষের এথেন্স, দক্ষিণাপথের বারাণসী—মাত্বরায়।

এই যে একটানা ছুটোছুটি, রাতজাগা, নানা অনিয়ম—কিছুমাত্র ক্লান্তি নেই তাতে।

এতো রাতেও দেখছি স্টেশনের কাছাকাছি দোকানপাট দিব্যি খোলা রয়েছে। 'প্রেমা লজ' নামে একটি হোটেলে আশ্রয় নেওয়া গেল—স্টেশনের একেবারে গায়ে। পরদিন ভোরে উঠে দেখি—কেবল আমরাই নই আরও অনেক মুসাফির এসে আশ্রয় নিয়েছেন এখানে। এঁরা সকলেই বোধ করি তীর্থযাত্রী। স্ত্রী-পুরুষ তুই-ই আছে।

সূর্যোদয়ের আগেই আমি বেরিয়ে পড়লুম নগর পরিদর্শনে। একটি রিকশা করা গেল। সেই প্রফুল্ল প্রভাতে মাত্বরাকে দেখে মনে হল পৃথিবীটা সত্যিই সুন্দর। পাণ্ড্যদের রাজধানী ছিল এই মত্বরাই। স্মরণাতীত কাল থেকে তামিলনাডের সারস্বত ক্ষেত্র মাত্বরা—বাংলার যেমন নবদ্বীপ। এ যুগের কলকাতা, সে-যুগের নবদ্বীপ। এ যুগের মাদ্রাজ, সে-যুগের মাত্বরা।

সুদূর অতীতে একদা বৃষভানু কুমারীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা অনুষ্ঠিত হয় বৃন্দাবনে। ঠিক তেমনি পাণ্ড্যকুমারী মীনাক্ষী দেবীর সাহচর্যে শিবের নিত্যলীলা অনুষ্ঠিত হয় এই মাত্বরায়। মাত্বরা তাই শৈবদের বৃন্দাবন।

মাদুরা মানেই মীনাক্ষী দেবীর মন্দির। আজ সমস্ত দিন আমরা এখানে আছি। মন্দির দর্শন এবং থিরুমল নায়কের ঐতিহাসিক প্রাসাদ দেখার পরে যখন আর কিছুই করণীয় থাকল না, তখন হঠাৎ বন্ধুদের খেয়াল হল বাড়িতে একটা খবর পাঠানো যাক। আপনারা খবর পাঠান চিঠি দিয়ে, এঁরা পাঠালেন শাড়ি দিয়ে—মাদুরার প্রসিদ্ধ শাড়ি।

শ্রীরঙ্গম-এর নীলকণ্ঠ আমায় শুনিয়েছিল 'নূপুর কাব্যে'র গান—নায়ক কোবলন জ্যোৎস্না-মধুর রাতে কাবেরী নদীর মোহানায় বসে যে গান শুনিয়েছিল প্রেমিকা মাধবীকে, সেই গান।...

কাজটা কিন্তু ভালো করেনি কোবলন। ব্যাপারটা রোমান্টিক হলেও গর্হিত, নীতিবিরুদ্ধ। ঘরে অমন সতী সাধ্বী পত্নী কন্নেগি, আর তাকেই পরিত্যাগ করে কিনা—

কিন্তু নাগরিক সভ্যতার এই হল অভিশাপ। দ্বিতীয় শতকের তামিলনাডের শ্রেষ্ঠ নগরী সমুদ্রতীরবর্তী পুহর। ঐশ্বর্যে ইন্দ্রপুরী, সম্ভোগে নাগলোক। সেই পুহরের নামজাদা নর্তকী মাধবীর নৃত্যভঙ্গিমায় মুগ্ধ হল কলারসিক কোবলন।

পরস্পরের পরিচয় হতে দেরি হল না। ধনবান বণিকপুত্র, তদুপরি মার্জিতরুচি, শিল্পরসিক, সুপুরুষ। হোক না বিবাহিত, এমন পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণে সুখ আছে। সেই দুর্লভ সুখের অধিকারিণী হল মাধবী।

কয়েক বছর মন্দ কাটল না। উচ্ছল যৌবনের রক্তরাগ, অনাস্বাদিত প্রেমের মধুরিমা, অনুপম নৃত্যগীতের উন্মাদনা।

কিন্তু ভুল করেছিল কোবলন। ভোরের আলোয় ঘাসের ডগায় যে শিশিরবিন্দু মুক্তো হয়ে ফোটে, হাতের মুঠোয় তা শুধুই এক ফোঁটা জল। পাদপ্রদীপের সামনে নৃত্যপরা যে উর্বশী, রঙ্গমঞ্চের বাইরে সে নিতান্তই একখানি রক্তমাংসের দেহ।

সামান্য ভুল বোঝাবুঝির ফলে ফাটল ধরে ওদের ভালোবাসায়। মোহমুক্ত কোবলন একদিন মাধবীকে ছেড়ে চলে যায়, লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে ফিরে আসে কন্নেগির কাছে। কিন্তু লক্ষপতি বণিক তখন লক্ষ্যহারা ভিক্ষুক।

ধৈর্যপ্রতিমা কন্নেগি স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—কিছু ভেবো না তুমি, মন দিয়ে কাজে নাম, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

—কিন্তু ব্যবসা করতে মূলধন চাই যে। আমার তো কিছুই নেই কন্নেগি। আজ আমি নিঃস্ব, রিক্ত, পথের ফকির। অনেকটা অভিনয়ের মতো শোনাল কোবলনের কথাগুলো।

ঘরে ছিল একজোড়া স্বুবর্ণ নূপুর। তারই একটি স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে কন্নেগি বললে—এই তোমার মূলধন।

বড়ো লজ্জিত হল কোবলন। মাধবীর নেশায় যে কন্নেগিকে ভুলেইছিল এতোদিন, শেষ পর্যন্ত কিনা তারই দয়া-ভিক্ষা ?

তা হোক, কিন্তু আর পুহর নয়। মাধবী রয়েছে এই শহরে, হঠাৎ হয়তো দেখা হয়ে যেতে পারে, দুর্বল মনকে কিছু বিশ্বাস নেই। তা ছাড়া নতুন করে ব্যবসায়ে নামতে হবে সামান্য মূলধন নিয়ে—গদিওয়ালা থেকে একেবারে ফেরিওয়ালার কাজে—তা সে পারবে না পুহরের পরিচিত সমাজে।

স্ত্রীর হাত ধরে পুহর ছেড়ে কোবলন চলে এল পাণ্ড্যরাজধানী এই মাদুরায়।…

ওয়াইখাই নদীর তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প শোনাচ্ছিল রামস্বামী —প্রাচীন তামিল সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নূপুর কাব্যের গল্প।···

এই মাদুরায় এসে বাসা বাঁধল কোবলন। পরদিন ভোরে নূপুর হাতে বেরিয়ে পড়ল স্বর্ণকারের সন্ধানে। কন্নেগি গৃহে অপেক্ষা করে আছে স্বামীর আগমন প্রত্যাশায়। বিদেশ-বিভূঁই, যতোক্ষণ না মঙ্গলমতো ফিরে আসে স্বস্তি নেই তার। নারীর স্নেহমাখা অন্তরে আশঙ্কার কালো ছায়া।

নগরে খুব শোরগোল—ভয়ানক একটা চুরি হয়ে গেছে রাজ-অন্তঃপুরে। মহারানীর নূপুর জোড়া থেকে খোয়া গেছে একটি নূপুর। কী সর্বনাশ! রাজমহিষীর নূপুর! ঢালাও হুকুম দিলেন পাণ্ড্যরাজ—যেমন করে হোক চোর ধরা চাই, আর শাস্তি তার প্রাণদণ্ড।

অপরাধী স্বয়ং রাজ-স্বর্ণকার। গদিতে বসে সে আত্মরক্ষার পথ খুঁজছে। এমন সময় কোবলন এল তার নূপুর নিয়ে।

—নূপুর! উল্লসিত হয়ে উঠল স্বর্ণকার। কোবলনকে বসিয়ে রেখে গোপনে সংবাদ পাঠাল রাজার কাছে—বমাল ধরা পড়েছে আসামি।

কোবলন বসে বসে ভাবছে ভবিষ্যত জীবনের কথা, কেমন করে সে গড়ে তুলবে তার নতুন জীবন। কেমন করে সে আবার হাসি ফুটিয়ে তুলবে কন্নেগির মুখে, কেমন করে সে আবার—

হুড়মুড় করে এসে পড়ে সিপাই-সান্ত্রির দল। কিছুই বুঝতে পারে না কোবলন, কী তার অপরাধ, কেনই বা তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে! মহিষীর নূপুর! না, না, এ যে তার স্ত্রীর নূপুর, কন্নেগির নূপুর, কন্নেগি, কন্নেগি—

চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল অপরাধীর কণ্ঠ—বিনাবিচারে শিরশ্ছেদ হল তার।

সংবাদ এসে পৌঁছল কন্নেগির কুটিরে। বিমূঢ় বিভ্রান্ত রমণী —বাকশক্তিহীন।—না, না, এ হতে পারে না, হতে পারে না। দুর্জয় প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠল নারীর কোমল অন্তর। অগ্নিবর্ষী চোখে রাজপথে বেরিয়ে এল কুলবধূ।

এই পর্যন্ত এসে রামস্বামী থেমে গেল।

—বটাচারিয়া তামিলটা শিখো ভাই। মাদুরাবাসী হয়ে কন্নেগির সেই নিদারুণ অভিশাপের কথা আমি তোমায় বলতে পারব না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রামস্বামী আবার শুরু করল—

মাদুরার রাজপথ সেদিন সচকিত হয়েছিল কন্নেগির আকুল আর্তনাদে—

শোন সবে মাদুরার সতীসাধ্বী কুলবধূ যতো,
শোন সবে অভাগিনী কন্নেগির করুণ ক্রন্দন।

সসম্ভ্রমে সবাই তাকিয়ে দেখল—কে এই নারী? মানবী না দেবী?

অবশেষে কন্নেগি খুঁজে পেল তার স্বামীর মৃতদেহ। সন্ধ্যার অন্ধকার বিদীর্ণ হল অভাগিনীর মর্মন্তুদ বিলাপে—

মাদুরার নরনারী, তোমরা শোন, তোমরাও শোন স্বর্গের দেবদেবী, ক্ষমাহীন অপরাধে অভিযুক্ত পাণ্ড্যনরপতি।

অকম্পিত পদক্ষেপে অশ্রুহীন নয়নে কন্নেগি এল রাজ-প্রাসাদের দ্বারে। রাজা বুঝতে পারল তাঁর ভুল। রাজমুকুট খসে পড়ল, হস্তচ্যুত হল রাজদণ্ড। মুহূর্তে ভূলুণ্ঠিত হল তাঁর প্রাণহীন দেহ।

কন্নেগি বেরিয়ে এল রাজপ্রাসাদ থেকে—যেন মূর্তিমতী

প্রতিহিংসা, অপরিতৃপ্ত জিঘাংসা। উন্মাদিনী কালভৈরবী চিৎকার করে বলল—মাদুরার নরনারী তোমরা শোন, তোমরাও শোন স্বর্গের দেবদেবী, আমি সতীসাধ্বী রমণী অভিশাপ দিচ্ছি—রাজার মতো ধ্বংস হয়ে যাক এই রাজধানী।

তারপরে এক বীভৎস কাণ্ড করে বসল সেই পাগলিনী। স্বহস্তে বাম স্তন ছিঁড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল মাদুরার রাজপথে! দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল মাদুরাই—বিবেকশূন্য পাণ্ড্যরাজের রাজধানী!

আমি শান্তরসের বাঙালি, কন্নেগির গল্প শুনে আমার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল অস্ফুট আর্তনাদ।

ওয়াইখাই নদীর উপরে ততোক্ষণে নেমে এসেছে সন্ধ্যার কালো ছায়া।

সন্ধ্যা নামল, আমরাও স্টেশনে এলুম। মাদুরা টু টেনিভেলি—স্থানীয় ভাষায় তিরুনেলভেলি। গাড়িতে একেবারেই ভিড় নেই। একটি বৃহৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় আমরা আরোহী মাত্র ছ-জন। ঘুমের মওকা পেয়ে সকলেই খুশি, কেননা কলকাতা ছাড়ার পরে নিদ্রার এমন স্বচ্ছন্দ অবকাশ আমাদের মেলেনি। কিন্তু কী আশ্চর্য, ঘুম আজ আর কিছুতেই আসছে না, কারও চোখেই নয়। কী আর করা যাবে! জুত করে মজলিস করা গেল সে রাত্রে।

রাত প্রায় তিনটের সময় গাড়ি এসে দাঁড়াল টেনিভেলি স্টেশনে। আকাশে চাপচাপ মেঘ, টিপ টিপ করে বৃষ্টি ঝরছে। আমরা যেদিকে নেমেছি, সেদিককার প্ল্যাটফর্ম তেমন

আলোকোজ্জ্বল নয়। একে বৃষ্টি, তায় আবছা অন্ধকার। মনের মধ্যে কী রকম একটা ভৌতিক অনুভূতি!

খোঁজ নিয়ে জানা গেল টেনিভেলি থেকে কন্যাকুমারীর যাত্রীবাহী বাস ছাড়ে ভোরের দিকে। তার আগে আছে ডাক-গাড়ি, তাতে অবশ্য যাত্রীবহনের ব্যবস্থাও আছে। যেই শোনা, অমনি তড়বড় করে উঠলেন অত্যুৎসাহীর দল। কেন রে বাপু, বাকি রাতটুকু কাটানো যায় না এখানে! হলই বা অখ্যাত স্টেশন, মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের ব্যাপার তো! আমার কিন্তু মন্দ লাগছিল না স্টেশনটা। অনায়াসে চা-কফি খেয়ে আরাম ও বিশ্রাম করা যেত। কিন্তু কন্যাকুমারীর আহ্বান বড়োই দুর্বার!

অতএব রাত সাড়ে তিনটায় যে মেলবাস ছাড়ে তাতেই গাদাগাদি করে বসা গেল। অবশ্য দাঁড়িয়ে কাউকে যেতে হয়নি, কারণ নির্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত যাত্রী ওরা বহন করে না। তামিল ভাষার দেশ। আরোহীরা সকলেই তামিলিয়ান। পাথরে খোদা মূর্তির মতো ওরা নীরব ও নিশ্চল। নিশুতি রাতের নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ হচ্ছিল কেবল কণ্ডাকটার ছোঁড়ার কর্কশ আওয়াজে। দুর্বোধ্য তামিল ভাষায় সে বারে বারে এই কথাই বোঝবার চেষ্টা করছিল—গাড়ির যে আগা-গোড়া লম্বা আসনটায় ১৫ জনের সিট সেখানে আমরা বসেছি মাত্র ১৩ জন। সুতরাং তাল্লিকোঙ্গো, তাল্লিকোঙ্গো—সরে বসুন, সরে বসুন।

হেডলাইট দিয়ে অন্ধকার ভেদ করে গাড়ি ছুটে চলেছে। মাঝে একটা জায়গায় নেমে চা পান করা গেল। যতোক্ষণ রাত্রি ছিল, প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছিল দুর্গতির একশেষ। কেন, আর একটু দেরি করে রওনা হলে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হত!

কিন্তু ভোরের আলো ফুটে উঠতেই সমস্ত যন্ত্রণা জুড়িয়ে

গেল। তন্দ্রাচ্ছন্ন জড়তার গর্ভ থেকে একেবারে চৈতন্যলোকে মুক্তি। মরি! মরি! কী অপরূপ ছবি! পাহাড়ে, প্রান্তরে, শ্যামল শস্যে, সবুজ ঘন তরু-পল্লবে আজি কি তোমার মধুর-মুরতি হেরিনু—শারদ প্রভাতে নয়, পউসের প্রত্যুষে!

গাড়ি ছুটে চলেছে। সুদীর্ঘ সরল কালো পিচের রাস্তা। পথ যতোই ফুরিয়ে আসছে, কন্যাকুমারীর আসন্ন মিলন প্রত্যাশায় দেহে মনে লাগছে আনন্দের শিহরণ। অবশেষে বেলা সাড়ে সাতটায় আমাদের যাত্রার শেষ লক্ষ্য—ভারত-মৃত্তিকার শেষ বিন্দু—কন্যাকুমারিকা!

ঐ যে সমুদ্র! ফেনিলোচ্ছল নৃত্যচঞ্চল অনন্ত নীলাম্বুরাশি—Vast expanse of the mighty waters! ডাকে যেন ডাকে যেন সিন্ধু মোরে ডাকে যেন……একি! কোথা থেকে ভেসে আসছে কোটি কণ্ঠোৎসারিত দূরাগত সঙ্গীতের সুগম্ভীর ধ্বনি—নীল-সিন্ধুজল-ধৌত চরণতল…

সমস্ত দেহমন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

বাস থেকে নামতেই গিয়ে দাঁড়াল কতোগুলো কিশোর বালক। ভিক্ষাপ্রার্থী নয়, ফটো বিক্রেতা। চমৎকার বাংলা শোনা গেল দু-একজনের মুখে। দাক্ষিণাত্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে স্থানীয় অধিবাসীর মুখে এমন সুন্দর বাংলা শোনা আমাদের পক্ষে একটা পরম বিস্ময়ের ব্যাপার।

কুমারিকাং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।—আমাদের সকলের মনোগত অভিপ্রায় ঐ একটি পংক্তি দিয়েই প্রকাশ করা যায়। কী হবে আর ঘুরে ঘুরে! দেখার চরম তো মিলল! আর নয়,

ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণতরী। ঠিক কথা, জীর্ণ জীবনতরী বেঁধে রাখাই ভালো। রেখেছিও। কিন্তু তা কন্যাকুমারীর বন্দরে নয়, স্কট লেনের উনিশ নম্বরে!

সম্পূর্ণ একটা দিন। পুরো চব্বিশটি ঘণ্টা। এতোদীর্ঘ বিশ্রাম যাত্রা পথের কোথাও আমরা করিনি। এখানে দেখার আছে ছুটো জিনিস—সমুদ্র আর সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কুমারী। বঙ্গোপসাগর, ভারতমহাসাগর, আরবসাগর—তিনদিক থেকে বিপুল জলরাশি বিশাল তরঙ্গ-ভঙ্গে অশ্রান্ত গর্জনে এসে আছড়ে পড়ছে সমুদ্রতটবর্তিনী কুমারী দেবীর পদপ্রান্তে। আর আমি মধ্যাহ্ন-ভোজনান্তে আরাম কেদারায় দেহখানি এলিয়ে দিয়ে চিঠির পর চিঠি লিখে চলেছি, আর মাঝে মাঝে কেবল চোখ তুলে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিচ্ছি ঐ সূর্যকরোজ্জ্বল অসীম পারাবারের দিগন্তে।

ছুপুরে আলাপ হল ভারত-ভ্রমণরত ছুটি জার্মান যুবকের সঙ্গে। বয়সে যেটি বড়ো তার একখানি পা হরণ করেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এদের ভ্রমণের একমাত্র সঙ্গী মোটর-বাইক। যেখানেই যায় তাঁবু খাটিয়ে আস্তানা গাড়ে। যদি কেউ আশ্রয় দেয়, সানন্দে গ্রহণ করে। কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলের জনৈক ধনীর গৃহে কিছুদিন আতিথ্য পেয়েছিল এরা। তার কার্ড দেখাল এবং কলকাতা-বাসের নিদর্শন স্বরূপ গুটিকয়েক বাংলা কথা শুনিয়ে আমাদের প্রচুর আনন্দ দিল। ইংরেজিতে জানতে চাইলুম—কলকাতা কেমন লেগেছে তাদের। বয়স্ক যুবকটি হাসিমুখে জবাব দিল—'বালো, কুব বালো।' দেশী-বিদেশীর সম্মিলিত অট্টহাস্যে ক্ষণেকের জন্য সমুদ্র-গর্জনও বুঝি চাপা পড়ে গেল।

অপরাহ্নে আমরা এসে দাঁড়ালুম সমুদ্রতীরে। কেপ

কমোরিন-এর প্রাণকেন্দ্র হল দেবী কুমারীর মন্দির। তারই আশেপাশে দু-একটা যা দ্রষ্টব্য রয়েছে। লোকজন খুব বেশি নেই। অধিকাংশই আমাদের মতো উড়ে-চলা পাখি। কেউ স্নান করছে, কেউ উঠছে গান্ধি-স্মারক-মন্দিরের চুড়োয়, কেউ বা সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছে বিবেকানন্দ রক-এর দিকে। স্বামী বিবেকানন্দ এখানে এসে সমুদ্র-দর্শনে অভিভূত হয়ে তপস্যার স্থানরূপে বেছে নিয়েছিলেন জল-বেষ্টিত একটা প্রকাণ্ড প্রস্তর-খণ্ড। সেই থেকে ওটি বিবেকানন্দ রক নামে পরিচিত। টুকিটাকি কেনা হল—কেনা হল সমুদ্র-জাত ঝিনুক-শামুকের মালা।

কন্যাকুমারীর একটি বড়ো আকর্ষণ—সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, সকাল সন্ধ্যায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বুঝেছি, পাপের বোঝা এখনও হালকা হয়নি।

এখানকার মন্দিরের একটা অভিনব বিধি হল—সেলাই করা কোনো কিছু নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করা চলবে না। জুতো গেঞ্জি শার্ট পাঞ্জাবি তো বটেই, এমনকি অন্তর্বাসও খুলে রাখতে হবে। আমাদের দলে কেউ কেউ ছিলেন স্যুট পরিহিত। ভাবুন তাঁদের অবস্থাখানা।

রেস্ট হাউজ-এ ফিরে এসে দেখি বাইরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড এক ঝকঝকে হিলম্যান। ঘরের ভেতর থেকে কলকণ্ঠ ভেসে এল। বুঝলুম কাদের বহন করে নিয়ে এসেছে এই গাড়িখানা! পাশাপাশি ঘর। অল্প-স্বল্প আলাপ হল। হায়দরাবাদ থেকে এঁরা সোজা এসেছেন এই গাড়িতে। থাকবেন দু-চারদিন।

কিন্তু যাবার সময় হল বিহঙ্গের। আমাদের মেয়াদ ফুরিয়ে এল। কাল সকালেই চলে যাচ্ছি আমরা।

ব্রেকফাস্ট সেরে যখন কেপ হোটেলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি তখন সবেমাত্র আটটা। ত্রিবান্দ্রামগামী স্টেট বাস এল বলে। এক্সপ্রেস বাস—৫২ মাইল পথ যাবে পৌনে তিন ঘণ্টায়। অর্থাৎ বেলা এগারোটা নাগাদ পৌঁছে যাব নয়া কেরালার রাজধানীতে।

মনে বেশ একটা ফুর্তি। কেপ হোটেল খানিকটা উঁচুতেই অবস্থিত। সেখানে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে মনে হল—I am monarch of all I survey. কেবল আমার নয়, দলের সকলের মনেই বেশ একটা ফুর্তি-ফুর্তি ভাব। মোটকথা পুরো চব্বিশ ঘণ্টা বিশ্রাম, তদুপরি কন্যাকুমারীর জলবায়ু এবং সর্বোপরি আমাদের হেভি ব্রেকফাস্ট সারিবাদি সালসার কাজ করেছে। ফটো তোলা হল।

স্টেট বাস ছুটে চলেছে। অতো বড়ো গাড়িতে আমরা সামান্য ক-টি যাত্রী। পাঁচজন বঙ্গবাসী অধ্যাপক, আর গুটিকয়েক দক্ষিনি। (নলিনীবাবু ইতিমধ্যেই দলত্যাগী হয়েছেন—হায় নলিনীবাবু!) সকাল বেলার আবহাওয়াটা অত্যন্ত মনোরম, যাকে বলে নাতিশীতোষ্ণ। ঠাণ্ডা বাতাসটুকু বেশ মিস্টি মিস্টি লাগছে।

গাড়ি ছুটে চলেছে। মনের আনন্দে দুচোখ ভরে দেখে চলেছি দক্ষিণের প্রকৃতিকে। অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে! এই তো অপরূপ আমার চোখের সামনে প্রসারিত—মাথার উপর অনন্ত নীলিমা, সম্মুখে সুমসৃণ চকচকে কালো রাস্তা, ডাইনে-বাঁয়ে প্রকৃতির অজস্র আশীর্বাদ। দ্রুতগামী গাড়িতে বসে মন অত্যন্ত বেগবান হয়ে উঠেছে।

গাড়ি চলেছে। বুঝতে পারছি কেরালার আর বড়ো বাকি নেই। রাস্তার পাশে দোকানপাটের গায়ে মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে মলয়ালি হরফ। মনের মধ্যে একটা খুশির আমেজ এল। বাপস্! এতোদিন ধরে তামিল ভাষার ঐ স্বল্প-পরিচিত সর্পাকৃতি অক্ষরগুলো কী নিদারুণ অস্বস্তি ধরিয়েছিল। মলয়ালি হরফ পেয়ে আমি যেন বেঁচে গেলুম। মনে হল যেন মায়ের কোলে এসেছি। একজন দক্ষিনিকে জিজ্ঞাসা করলুম—মাদ্রাজ ছাড়িয়ে আমরা কি কেরালায় পড়েছি?

—না, এখনও পড়িনি। আর একটু পরেই।

হ্যাঁ, ঐ যে আসছে মাদ্রাজ-কেরালার সীমারেখা। বেশ বড়ো বড়ো হরফে লেখা রয়েছে—ENTER KERALA. দ্রুতগামী বাস থেকে মুহূর্তে দেখে নিয়েই মনের আনন্দে সমবেত কণ্ঠে জয়ধ্বনি ও জিন্দাবাদ করে ফেললুম।

শুরু হল তিরুবিতাঙ্কুর, যাকে আপনারা মুখ বাঁকিয়ে বলেন—ট্র্যাবান্‌কোর। বাস ছুটে চলেছে। কিছুমাত্র ক্লান্তি নেই। মনে এল গুনগুনিয়ে—ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে! আহা এমন করে তো কোনোদিনই অনুভব করিনি কবির আবেগময়ী বাণী। মাদ্রাজ থেকে কেরালার প্রকৃতি আরও সুন্দর। আজ ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৫৭। এই দিনটির জন্যই কি এতো আনন্দ সঞ্চিত ছিল! যা দেখেছি যা পেয়েছি সত্যিই তার তুলনা নেই।

খানিক পরেই এসে গেল—তিরুঅনন্তপুরম—ট্রিব্যাণ্ড্রাম।

কবিগুরু বলেছেন—লাগিল পাণ্ডা নিমেষে প্রাণটা করিল

কণ্ঠাগত। আমাদেরও সেই দশা হল নাম্বুদিরিপাদের রাজধানীতে এসে। পাঁচজন নিরীহ বঙ্গসন্তানকে দেখেই ছেঁকে ধরল—পাণ্ডা নয়, ট্যাক্সি দালালের দল। এক নয়, দুই নয়, চারিদিক থেকে অজস্র।

আমাদের গন্তব্যস্থল কোচিন-এর্নাকুলম। এখান থেকে প্রায় দেড়শো মাইল দূর। রেলগাড়িতে পুরোপথ পাওয়া যায় না। লাইন তৈরি হচ্ছে, শিগগিরই খোলা হবে। কিন্তু সে তো ভবিষ্যতের কথা। এখন আমাদের অবলম্বন স্টেট বাস অথবা ট্যাক্সি। বাস ছাড়বে সন্ধ্যা ছ-টায়, পৌঁছুতে রাত দুপুর গড়িয়ে যাবে। কিন্তু না, অতো রাত করা যায় না, সুতরাং কর ট্যাক্সি। এবং সেই ট্যাক্সির খোঁজে এসে পড়ে গেলুম দালালদের খপ্পরে।

—ওর গাড়িতে যাবেন না স্যার, তাহলে মাঝপথেই থাকতে হবে।

—দেখছেন তো ওর লজঝড়-মার্কা গাড়িখানা, চড়তে সাহস হয়।

—দেখুন স্যার একবার এদিক তাকিয়ে, চড়বেন তো ময়ূর-পঙ্খির মতো উড়িয়ে নেবে।

—এদিকে আসুন স্যার, কিছু সস্তায় করে দেব।

—ওকে বিশ্বাস করবেন না, পাকা কম্যুনিস্ট।

আমরা হেসে বললুম—কেরালায় এসেছি, তবে তো ওর গাড়িতেই যেতে হয়।

—না ঠিক কম্যুনিস্ট নয়, মানে সুডো-কম্যুনিস্ট। আসলে পি. এস. পি, তার আগে ছিল কংগ্রেসি।

দালাল হলেও ওদের রসবোধ আছে বলতে হবে। কিন্তু এই রসিকতা উপভোগ করবার মতো সময় আমাদের নেই। অনেক

টানা-হেঁচড়ার পরে ঠিক করা গেল একখানা গাড়ি—ত্রিবান্দ্রাম শহর ঘুরিয়ে দেখাবে তজ্জন্য দশ আর এর্নাকুলম-এর জন্য পঁয়ত্রিশ একুনে পঁয়তাল্লিশ টাকা।

উঠে পড়া গেল ট্যাক্সিতে। প্রথমে ভোজন। জঠরাগ্নি দাউ-দাউ করে জ্বলছে—ঠাণ্ডা করা দরকার মহাপ্রাণীকে। ব্যস, পেট্রোলভর্তি ইঞ্জিন যেমন জোরদার হয়ে ওঠে, তেমনি চালু হল আমাদের প্রাণশক্তি। ট্যাক্সিতে চড়ে মালপত্র চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লুম শহর-দর্শনে। পদ্মনাভ স্বামীর মন্দির, একুআরিয়ম (Aquarium) ও সমুদ্রতট—এই তিনটি জায়গা বেশ ভালো করে দেখা গেল—বাকি সব বুড়ি-ছোঁয়া গোছের।

মন্দিরের অভ্যন্তরে আমি আর যাইনি। দেব-দ্বিজে আমার ভক্তি বিশেষ নেই, তাছাড়া নাম্বুদিরিপাদের দেশে ওটা অত্যন্ত বেমানান। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক। আলাপ জমানো যাক ট্যাক্সিচালকের সঙ্গে। শুরু হল আলাপ আমার টুটা-ফুটা মলয়ালম-এ। নাম গৌরীনাথ পিল্লে। এর আগে কাজ করেছে সৈনিক বিভাগে, হিন্দী বেশ ভালোই জানে, ইংরেজিও জানে কিছু কিছু। লোকটির বিদ্যাবুদ্ধি যাই হোক, দেখতে শুনতে ভদ্র বলেই মনে হল। কথা বলে খুব কম।

গৌরীনাথকে দেখে মনে পড়ে গেল টেনিভেলির জনৈক সহযাত্রীর কথা। জিজ্ঞাসা করেছিলুম—আপনারা তামিলিয়ান, কেরালার কম্যুনিস্ট সরকার সম্বন্ধে কী মনে করেন? ভদ্রলোক উত্তর দিয়েছিলেন—ওরা কথা বেশি বলে না, But they plan their work and work their plan.

হ্যাঁ বাপু, এখানে কথা বেশি চলবে না। কিন্তু আমি অতিথি, ওসব নিয়ম আমার জন্যে নয়।

কথার মাঝে এক সময়ে চোখ পড়ল—গাড়ির মধ্যে পড়ে

আছে একখানি হ্যাণ্ডবিল। তুলে নিলুম। গৌরীনাথ জিজ্ঞাসা করল—পড়তে পারেন?

পড়ে শোনাচ্ছি, শুনুন।

কাগজখানি একটি নাট্যাভিনয়ের হ্যাণ্ডবিল। কোনো প্রগতিশীল নাট্যকারের লেখা জনসমস্যার উপরে নাটক—মুণ্ডীয়নায় পুত্রন (The Prodigal Son)। গৌরীনাথ খুবই প্রশংসা করল নাটকের। অভিনেতা অভিনেত্রীরাও বেশ প্রসিদ্ধ। কিন্তু আমরা তো আজই চলে যাচ্ছি, দুঃখ এই যে দেখা হবে না।

সঙ্গীগণ এসে পড়লেন। আবার চক্কর। এবারে এলুম সমুদ্রতটে। ত্রিবান্দ্রাম শহর থেকে সমুদ্র একটু দূরেই। কিন্তু আমাদের বড়োই ভালো লাগল সমুদ্র সৈকত। মাদ্রাজের স্ট্র্যাণ্ড রোড থেকে সমুদ্রসৈকতে ছুটে যাবার স্পৃহা হয়নি, এখানে কেন জানি না গাড়ি দাঁড়াতেই সকলে হুটোপুটি করে ছুটতে আরম্ভ করলুম। দুটি প্রায়-নগ্ন বালক পয়সার বিনিময়ে সমুদ্রের জলে কসরত দেখাবার অনুমতি চাইল। দিলুম অনুমতি। এদিকে ক্যামেরাম্যান অধ্যাপক সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বালুর উপরে বসে পড়েছেন—এই পটভূমিকায় একটা শট না নিলেই নয়।

অতঃপর আমাদের সেই স্মরণীয় যাত্রা—ত্রিবান্দ্রাম টু এর্নাকুলম। পঞ্চাশ মাইল বেগে গাড়ি ছুটে চলেছে। অদ্ভুত চমৎকার রাস্তা, অদ্ভুত বালক গৌরীনাথ। এমন না হলে কি গতির আনন্দ পাওয়া যায়? এবার আমাদের বাঁধন খুলে গেল। মানসিক

ফুর্তি প্রকাশের আদিম ও শ্রেষ্ঠ উপায় হল গান। সেই গানই আরম্ভ হল—আধুনিক গান, রবীন্দ্র-সঙ্গীত, সিনেমার গা—। কী সর্বনাশ! কলেজের অধ্যাপক হয়ে কি না··· !

কিন্তু বাজিমাত করেছে সেই রবীন্দ্র-সঙ্গীতখানি—আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ। কবিগুরু অবশ্য বলেছেন—'পথ চাওয়াতেই আনন্দ', কিন্তু সুর যা দিয়েছেন তাতে মনে হয় ঘরে বসে পথ চাওয়ার মধ্যে এতো মাদকতা থাকতে পারে না। সুতরাং ওটা ঠিকই হবে—পথচলা, পথ-চাওয়া নয়।

গৌরীনাথ স্থির নিস্পলকচোখে স্টিয়ারিং ধরে আছে। তাকে একবার জিজ্ঞাসা করলুম—বাঙালি সুর ও বাংলা গান তোমার কেমন লাগছে? সে একটু হেসে মাথা নেড়ে জবাব দিল—মন্দ নয়।

গাড়ি ছুটে চলেছে। চল—চল—চল। ইস দুনিয়া মে রোখনেওয়ালা কোই হ্যায়!—কোই নেহি হ্যায়। মনে পড়ে গেল তারাশঙ্করের 'অভিযান' উপন্যাসের ড্রাইভার নায়ক নরসিংহের শেষযাত্রা।

কুইলনে নেমে কফি খাওয়া গেল। আবার চল—চল! নামা গেল আল্লেপ্পেতে। মাঝখানে পার হতে হল বিরাট খরস্রোতা নদী পেরিয়ার। ব্রিজ দিয়ে নয়, ফেরি নৌকো দিয়ে।

রাত সাড়ে আটটায় গাড়ি এসে দাঁড়াল এর্নাকুলম শহরে মডার্ন হোটেলের সামনে। থাকা ও খাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা। চমৎকার পরিচ্ছন্ন হোটেল। প্রচুর খাওয়া হল রাতে। নিরামিষ ভূরিভোজ এতোটা আর কোথাও হয়নি। (প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখছি, দক্ষিনি খানাপিনায় ইতিমধ্যে আমরা অনেকটা অভ্যস্ত হয়েছি।) খেয়েদেয়ে শুতে যাব এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে ভেসে এল পরিচিত হিন্দী গানের সুর। দক্ষিণ ভারতে হিন্দীগান শুনে মনটা খুব খুশি।

পরদিন ভোরে বেরিয়ে পড়লাম কোচিন-হারবারের উদ্দেশ্যে। লঞ্চ-এ মাথা পিছু মাত্র ছু-আনার টিকিট করে গিয়ে পৌঁছলুম কোচিনে। নদীপথে যেতে যেতে মনে এল ছেড়ে-আসা পূর্ব বাংলার কথা। জলের দেশের মানুষ, মাঝে মাঝে জলচর হতে পারলে খুশি হই। কোচিনের পুরোনো ক্রিশ্চিয়ান এলাকা কোচিন ফোর্ট নামে পরিচিত। সেখানে গিয়ে দেখে এলুম ভাস্কো-ডি-গামার স্মৃতিফলক, দেখে এলুম সমুদ্রতীরে মাছ ধরছে জেলেরা, আর দেখলুম অমিরুন্নেসাকে। দরিদ্র ঘরের মুসলমান কিশোরী ছোট বোনকে নিয়ে এসেছে মাছ কিনতে। সমুদ্রের বিশাল পটভূমিকায় বড়োই ভালো লাগল ঘাঘরা-পরা এই ছুটি ছোট্ট মেয়েকে। হয়তো আবার কোনোদিন এখানে আসব, কিন্তু বাস্তব জগত থেকে চিরকালের জন্য মুছে গেল এই ছবিটি।

২৯শে ডিসেম্বর। আবার মাদ্রাসের পথে। ছুপুরের গাড়িতে উঠলুম কোচিন টার্মিনাস থেকে। প্রায় সাড়ে চারশো মাইল রাস্তা। এবারকার সহযাত্রীদের বেশির ভাগ মলয়ালি। একে একে আলাপ পরিচয় হল অনেকের সঙ্গে। ভবদাসন—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে মলয়ালম ভাষার অধ্যাপক। তরুণ যুবক ওমেন আব্রাহাম—এখনও ছাত্র, তার বাবা আলুয়ে ইউ. সি. কলেজের অধ্যাপক। সহস্ররাম আইয়ার—ডোমিসাইলড তামিল ব্রাহ্মণ। আরও অনেকে।

নিসর্গ-শোভা দেখতে দেখতে কালিদাসের একটা ভুল আবিষ্কার করা গেল। মহাকবি বলেছেন—তমালতালী বনরাজি-নীলা। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে কোথাও সে চিত্র দেখিনি, চোখের

সামনে যা দেখতে পাচ্ছি তা হল কদলীতালী-নারিকেল-নীলা।

রেল লাইনের দুধারে কলাগাছের নিরবচ্ছিন্ন সারি দেখে আমার মনে পড়ল মলয়ালি কবি চাঙ্গম্পুড়ার সেই কবিতাটি—'বাড়ক্কুলা'। বর্ষা নামল, গ্রামের গরিব গৃহস্থ মলয়পুলয়ন আঙ্গিনার কোনে রোপণ করল একটি কদলীশিশু। মানুষের মনে যেমন আশা ওঠে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে, তেমনিভাবে ফুটে বেরুল একটি একটি করে ঘন সবুজ কচিকোমল পাতা। দীর্ঘ ন্যারেটিভ কবিতা। কোচিন এক্সপ্রেস ছুটে চলেছে। চলন্ত গাড়িতে চোখ বুজে সুর ভাঁজার চেষ্টায় আছি—

মলয় পুলয়না মাডত্তীন মুট্টত্তে
মড় বন্ন না লোরু বাড় নট্টু।
মনতারিল আশাকল পোলতিল ওরোরো
মরতককুম্বু পোটিচ্চু বন্নু।

ভবদাসন-এর চোখেমুখে বিস্ময়-মাখানো আনন্দের হাসি। আমার কণ্ঠ থেকে সুর কেড়ে নিয়ে নিজেই শোনাতে লাগল—মলয় পুলয়না মাডত্তীন মুট্টত্তে···বর্ষা নামল···কলাগাছের ভেতর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে এক একটি ঘন সবুজ কচিকোমল পাতা।

কেরালার উপর দিয়েই চলেছি। চলতে চলতে দু-পাশে তাকাচ্ছি কেরলীয় মেয়েদের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করবার জন্য। একটা উদ্ভট শ্লোকে পড়েছিলুম ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মেয়েদের বিশেষত্বের কথা। বাঙালি মেয়ের সৌন্দর্য তার কুন্দশুভ্র দন্তাবলিতে, কেরলি মেয়ের গৌরব তার সুদীর্ঘ কেশকলাপে। কিন্তু হায়! আজ বাঙালি মেয়ের দন্তশোভা যেমন Dentist-এর হাতে, কেরলিনীর কেশ-মহিমাও তেমনি হয়ে দাঁড়িয়েছে অতীতের বস্তু।

কোচিন এক্সপ্রেস একে একে পার হয়ে এল আলুওয়া, চালকুড়ি, ত্রিচুড়, সোরনুর, ওলবক্কোড—ব্যস, আমরাও কেরালার সীমারেখা পার হয়ে এসে পৌঁছলুম কোয়ম্বতুর অর্থাৎ মাদ্রাজ রাষ্ট্রে। এতো ছোটো কেরালা যে শুরু হতে না হতেই শেষ। সমুদ্রের তীরে তীরে কেরালা গড়ে উঠেছে, যেন সাগর-গর্ভ থেকেই তার জন্ম—কেরালা সাগরিকা। পুনর্দর্শনায় বলে বিদায় নিলুম সাগরিকার কাছে।

মাদ্রাজ থেকে যাত্রা করেছি ২৩শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আর পৌঁছলুম এসে ৩০শে ডিসেম্বর সকালে। ঠিক সাতদিনে দেখা হল দক্ষিণ ভারতের দক্ষিণতম অংশ—তামিলনাড ও কেরালা। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। রাষ্ট্রভাষায় একটি কবিতা পড়েছিলুম সাতদিনে ভারত দেখার বর্ণনা—

সোমবার কো চলা, হো গয়ী জগন্নাথ মেঁ শাম,
মঙ্গল কো কলকত্তা জাকর কিয়ে বহুত সে কাম...

তারপরে বুধবারে কাশী অযোধ্যা দর্শন করে এলুম আগ্রায়, বৃহস্পতিবার দিল্লি থেকে দ্বারকা, শুক্রবার বোম্বাই ও ব্যাঙ্গালোর শেষ করে শনিবারে রামেশ্বরম এবং রবিবারে গৃহে প্রত্যাবর্তন। এইভাবে সাতদিনোঁমেঁ আপনা ভারত দেখ্ মৈঁয় লওট্ আয়া। আমরাও সাতটি দিনের মধ্যে দক্ষিণাপথ-পরিক্রমা করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলুম।

অর্থাৎ মাদ্রাজ ফিরে এলুম। আপাতত এই আমাদের ঘর। পশ্চিম বঙ্গের প্রতিনিধিরা আছেন ন্যাশনাল হাইস্কুলে। পোঁটলা-পুঁটলি সমেত সেখানেই গিয়ে উঠলুম। মাথা গোঁজার ঠাঁই তো একটা পাওয়া গেল।

জায়গাটা মন্দ নয়—হার্ট অব দ্য সিটি। নাম ট্রিপ্লিকেন। স্কুলের বাড়িটি আরও সুন্দর। কলকাতার অনেক নামকরা কলেজকেও হার মানাতে পারে। ত্রিতলের একটি প্রকাণ্ড কক্ষে পরিচ্ছন্ন মেজের উপর যে-যার হোল্ড-অল বিছিয়ে নিয়ে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিলুম। সকলের মুখ থেকে একই সুরে বেরিয়ে এল—আঃ কী আরাম!

খানিকক্ষণ পরে এসে দাঁড়াল ১৪।১৫ বছরের একটি কিশোর। ব্যাজ থেকে বোঝা গেল—স্বেচ্ছাসেবক। মুখে কোনো 'কথা নেই, কিন্তু ভাবখানা—আমাদের জন্য কিছু একটা করতে পারলে ভারি খুশি হয় সে। সাতদিনের ভ্রমণে যে দুটো-চারটে শব্দ শিখেছিলুম তাই দিয়েই আলাপ শুরু করা গেল।

—ইঙ্গে বা।

কাছে এসে দাঁড়াল ছেলেটি।

—পেয়র এন্না?

—রাজু চেট্টিয়ার।

—রাজু? বেশ বাঙালি নাম তো! চেহারাটাও কেমন বাঙালি বাঙালি। ক্লান্ত জিভ দিয়ে বাংলাই বেরিয়ে এল কোন ফাঁকে—একটু গরম জল চাই যে রাজু।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল আর্যভাষা অনভিজ্ঞ দ্রাবিড় সন্তান। পরক্ষণেই ভুল শুধরে নিলুম—ওঃ থুড়ি, সুড়ু তন্নির—সুড়ু তন্নির বেণ্ডুম। বুঝলে?

ঘাড় দুলিয়ে হাসিমুখে চলে গেল রাজু।

আজ আমাদের মাদ্রাজ দেখার পালা—যাকে বলে সাইট সিইং। নগরীর বাণিজ্য কেন্দ্র জর্জ টাউন দিয়েই শুরু করা যাক। দেশী-বিদেশী বণিকদের যতো বড়ো বড়ো দফতর এই অঞ্চলে—এ যেন আমাদের ডালহৌসি স্কোয়ার।

সপ্তদশ শতকের শেষদিকে হুগলী নদী বেয়ে জব চার্নক এসে পদার্পণ করেন সুতানুটিতে—যার পরিণাম কলকাতা। তারও পঞ্চাশ বছর আগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অন্যতম বণিক ফ্রান্সিস ডে এসে অবতীর্ণ হন এখানকার সমুদ্রতটে—যার পরিণাম মাদ্রাজ পট্টনম। ইয়োরোপীয় বণিকদল সুযোগ পেলেই হুটো জিনিস করতেন—একটি বাণিজ্য কুঠি আর একটি হুর্গ। অর্থোপার্জন ও আত্মরক্ষা। কলকাতার সূচনায় ফোর্ট উইলিয়ম, মাদ্রাজের সূচনায় ফোর্ট জর্জ। ফোর্ট উইলিয়মের অদূরেই গড়ে ওঠে চৌরঙ্গি, ফোর্ট জর্জকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয় জর্জ টাউন।

কলকাতার মতো মাদ্রাজেও রয়েছে উত্তর দক্ষিণের পার্থক্য। উত্তর মাদ্রাজ ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র, দক্ষিণ মাদ্রাজ সংস্কৃতির পীঠস্থান। কলকাতার উত্তর-দক্ষিণের মাঝে রয়েছে গড়ের মাঠ। মাদ্রাজকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে পূর্ববাহিনী-কুওম নদী।

হাইকোর্ট, অ্যাসেম্বলি, ম্যুজিয়ম, লাইট হাউস—টুরিস্টদের বিস্তর দ্রষ্টব্য রয়েছে এখানে। কিন্তু আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি—রয়াপুরম। যাকেই জিজ্ঞাসা করি, উত্তর পাই—রয়াপুরম? সেখানে যাবেন কোন হুঃখে! দেখার কী আছে ওখানে!

আছে, আছে। একটি বাঙালি যুবক এসে আশ্রয় নিয়েছিল এই রয়াপুরম-এ—আজ থেকে একশো দশ বছর আগে একটি চব্বিশ বছরের বাঙালি যুবক। গোপনে, সকলের অজ্ঞাতে। স্থানীয় জনসাধারণ সেদিন অবাক হয়েছিল—কেবা এই অপরিচিত এল আমাদের মাঝে—Who is this stranger that is come amongst us?

যুবকটি ভেবেছিল—মাস্টারি আর সাংবাদিকতা করেই জীবনটা কেটে যাবে এই Benighted Madras-এ। দেশের লোকও ভুলতে বসেছিল তাকে। অনেকে তো ধরেই নিয়েছিল

লোকটা আর বেঁচে নেই। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে এই রয়াপুরম-এর অজ্ঞাতবাসে চলেছে তার কঠোর নিভৃত সাধনা।

রয়াপুরম পেলাম বটে, কিন্তু বাড়িটি খুঁজে পেলাম না। কেউ সন্ধান দিতে পারে নি।

—কী বললেন? এম. এস. ডাট? কদ্দিন আগে ছিলেন? একশো বছর? বাই মুরুগন, তখন আমার গ্র্যাণ্ডফাদারও জন্মান নি।

মুণ্ডিতশির মদ্রসন্তান আমার দিকে বিষম দৃষ্টি হেনে মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেলেন।

তা যান। কিন্তু উনিশ শতকে একদিন এই সমুদ্রকূলবর্তী মাদ্রাজ—এই রয়াপুরম—আশ্রয় দিয়েছিল বঙ্গমাতার নির্বাসিত বিদ্রোহী সন্তানকে, সেই কথা ভেবেই বিংশ শতকের এক নগণ্য বাঙালির অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল।

ট্যাক্সি চলেছে পল্লবরাজ্যের মধ্য দিয়ে—মাদ্রাজের সন্নিহিত দক্ষিণাঞ্চল।

আপনি হয় তো আর কিছুতেই বিস্ময় বোধ করেন না, থ্রিল অনুভব করবার ক্ষমতাও হয় তো হারিয়েছেন কলকাতার ক্রনিক ডিসপেপসিয়ার ফলে। তবু বলি একবার ভেবে দেখুন—এই সেই প্রাচীন পল্লবনাড়ু যেখানকার রাজা সিংহবিষ্ণু ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে দাক্ষিণাত্যের চের-চোল-পাণ্ড্য সমস্ত রাজ্য জয় করে তামিল সংস্কৃতির ঐক্যসাধনে সহায়তা করেন।

পল্লব-রাজবংশের সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে আছে একটি নাম—কঞ্জিভেরম। শাড়ি নয়, রাজধানী—পল্লব-রাজধানী কঞ্জিভেরম।

আসলে কাঞ্চীপুরম। ইংরেজদের কল্যাণে পরিচিত নামগুলিও কেমন অপরিচিত বলে মনে হয়। কাশী কাঞ্চী হরিদ্বার উজ্জয়িনী মথুরা অযোধ্যা দ্বারকা—ভারতের এই সমস্ত তীর্থের অন্যতম কাঞ্চীপুরম।

আপাতত আমরা চলেছি কাঞ্চীপুরমকে ডাইনে রেখে সমুদ্রের তীরে তীরে সপ্তরথের বন্দরে। পল্লব চুড়ামণি মহামল্ল নরপতি নরসিংহ বর্মার শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই বন্দর, এই বন্দরের অপূর্ব ভাস্কর্য।

মাদ্রাজ থেকে মাত্র ৫৩ মাইল—কতোটুকুই বা পথ! শীতের মধ্যাহ্নে গাড়ি থেকে নেমে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিলুম চারিদিকে। কিপলিং-এর কথা মনে হল—A withered beldame dreaming of ancient fame.

সত্যিই প্রাচীন কীর্তি ছাড়া মহাবলিপুরম-এর আজ আর গৌরব করবার মতো কিছুই নেই। দু-হাজার বছর আগে এখানকার পথে পথে ছিল সুসজ্জিত বিপণিমালা, উত্তুঙ্গ সৌধরাজি, ঘাটে ঘাটে এসে ভিড় জমাত দেশ-বিদেশের বাণিজ্য-তরী। আর আজ সেই প্রাচীন বন্দর নির্জন সমুদ্রসৈকতে বসে অতীতের স্মৃতি-চারণায় তন্ময়! এ উইদার্‌ড বেলডেম ড্রিমিং অব এনস্সেণ্ট ফেম!···

প্রচ্ছন্ন ছায়াবীথিকায় পিকনিকের আসর বসেছে এখানে-ওখানে। আঁচল ঘুরিয়ে, ওড়না উড়িয়ে পরিবেশন করছেন বিনোদিনীর দল। আর অত্যন্ত স্থূলভঙ্গিতে ডিশ-কে-ডিশ সাবাড় করে দিচ্ছে নব্য ঘটোৎকচবৃন্দ।

হায় মহাবলিপুরম! বৃথাই তুমি ভাস্কর্যের পসরা নিয়ে শতাব্দীর প্রহর গুনছ!

পিছনের কোনো তাড়া নেই। শিথিল অলস ভঙ্গিতে ঘুরে ঘুরে দেখছি। আর এক একবার করে তাকাচ্ছি সমুদ্রের দিকে।

গাছের ফাঁকে ফাঁকে মন্দিরের আশেপাশে নীলাম্বুর অকূল বিস্তার।

পাণ্ডাদের ডাকিনি, তবু তারা এসে লেকচার শুরু করে দেয়: দিস টেম্পল—মনোলিথিক—নাট আব ব্রিক্‌স, ওয়ান স্টোন—মার্বেলাস—ইজ ইট নাট? ছ্যাট ওয়ান—অর্জুনাস পেনান্‌স—হিয়ার ইজ মহাদেও—দেয়ার ইজ অর্জুনা—ডুইং বেরি হার্ড পেনান্‌স—তপসসিয়া করতা—তুম লোগ তপসসিয়া নহী সমজতা?

—ওরে বাবা, তপস্যা খুব বুঝি, তোমাকে আর বোঝাতে হবে না। এবারে মানে মানে বিদায় হও দেখি!

সামান্য দক্ষিণা দিয়ে বিদায় করতে চাইলুম, কিন্তু ছাড়ালে না ছাড়ে। ওরা দক্ষিণে যায় তো আমরা উত্তরে মুখ ঘোরাই। কিন্তু সেখানেও আবার শুরু হয়—হিয়ার ইজ ফাইভ টেম্পল, ফাইব রথস—ইউধিস্টিরা, ভীমা, অর্জুনা, নকুলা, সহদেবা—অর ইয়ে দ্রওপদি হ্যায়। পাণ্ডবস লিব্‌ড হিয়ার······

বলে কী লোকটা? পাণ্ডবস লিবড হিয়ার? পাণ্ডবেরা এসেছিল নাকি এখানে? তা হবেও বা। নির্বাসনের দীর্ঘ সময়টা ঘুরে ঘুরে কাটাতে হয়েছে তো। কিন্তু কোথায় হস্তিনাপুর, কোথায় বা মহাবলিপুরম?

আপনার যদি স্থাপত্য বিজ্ঞানে দখল থাকে, কিংবা রুচি থাকে ভাস্কর্য-কলায়, তবে আসবেন, সময় করে একবার আসবেন এই মহাবলিপুরম। আমরা মুকখু-সুকখু লোক, স্থাপত্যের কী জানি? আর ভাস্কর্যের বুঝিই বা কতোটুকু?

ঐ দেখুন না, দাঁড়িয়ে আছে একটি বিরাট মন্দির—যেন জগন্নাথের রথ। কাছে এসে দেখুন—ইটের পর ইট সাজিয়ে নয়, পাথরের পর পাথর চাপিয়ে নয়, একটা গোটা পাহাড়কে

কেটে কেটে তৈরি করা হয়েছে এই মন্দির—এই আশ্চর্য শৈলমন্দির।

ওমা, হাতিও আছে নাকি এই সমুদ্রতটে! কী ছেলেমানুষ! এটা কি আসামের অরণ্য না মাইসোরের পাহাড়! পাথরে খোদাই হাতি দেখে সত্যি হাতি বলে ভ্রম হল আপনার!

এবারে চলে আসুন এই সমুদ্রতটে—দাঁড়ান এসে এই তট-মন্দিরের ছায়ায়। এমনি ধারার কতো মন্দির এখানে ছিল, ধীরে-ধীরে তারা আশ্রয় নিয়েছে সমুদ্রের বুকে। এই-বা আর কতোদিন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে একা একা? এরপরে যদি কখনো আবার আসা হয়, হয়তো দেখবেন এই মন্দিরটিও আর নেই। তবে হ্যাঁ, একে বাঁচাবার চেষ্টা চলেছে সরকারের পক্ষ থেকে। দেখছেন না এখানে কতোভাবে সমুদ্রকে বাঁধার আয়োজন?

একবার এখানে এসে দাঁড়ান, হ্যাঁ এখানে, এই মন্দিরের সোপানে—সমুদ্রের দিকে মুখ করে। কী একটা প্রবল ইচ্ছে হচ্ছে না? আকুল ও অনির্বচনীয়? যদি আপনি ভাবুক হন তো আপনার উদাত্ত কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসবে—হে আদি জননী সিন্ধু···। যদি আপনি গায়ক হন তো সুরের মূর্ছনায় আকাশ ভরে উঠবে—ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে···। যদি আপনি—

ততোক্ষণে হয় তো আপনার চোখ পড়ে গেল নিচের দিকে। নির্জন সমুদ্রসৈকতে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে একটিমাত্র রমণী। কপালকুণ্ডলা নয়—বেণীকুন্তলা।

আপনি চাই ভাবুক হোন আর নাই হোন, আপনাকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হবে ঐ মেয়েটির দিকে, মিলিয়ে দেখতে হবে—নারী ও সমুদ্র······

মহাবলিপুরম এসে যদি এই দৃশ্যই আপনার চোখে না পড়ল

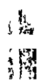
তো বৈষ্ণব কবির ভাষায় বলতে হয়—সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ু তার মুণ্ডে বাজ, সে নয়ন রহে কি কারণ !

বিদায় মহাবলিপুরম !

বিদায় তামিলনাড়ু ! যেটুকু দেখলুম তার অনেক বেশিই অদেখা থাকল। যেটুকু জানলুম তার শতগুণ রইল অজানা। শিক্ষায় সভ্যতায় শিল্পে সাহিত্যে তুমি প্রবীণা—দু-হাজার বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত তোমার সংস্কৃতি। তোমার কোলে জন্ম নিয়েছে তিরুবল্লুবর-ঔবৈয়ার, আলোয়ার ও নয়নমার, কম্বন ও ভারতী। তোমার বুকে রচিত হয়েছে পাহাড়-কাটা মন্দির, আকাশ-ছোঁওয়া গোপুরম। চরণে তোমার নটরাজের প্রলয় নৃত্য, কণ্ঠে ত্যাগ-রাজের সঙ্গীত। যুগ-সঞ্চিত ঐশ্বর্য তোমার, দুদিনের পরিচয়ে তা নিঃশেষিত হবার নয়।

আবার আ: বারে বারে আসব তোমার কাছে। আমার মন পড়ে রইল তোমার মৃত্তিকায়, তোমার তাল-নারিকেলের স্নিগ্ধ ছায়ায় ; তোমার সমুদ্রতটে, কাবেরী তাম্রপর্নীর ঘাটে ; তোমার মুল্লই-কুরিঞ্জি-মরুদম-এ—অরণ্যে-পর্বতে-কৃষিক্ষেত্রে।

পঞ্চনদীর তীরে



বর্ধমানের সীতাভোগ খেয়ে নলিনীবাবু সেই যে লেপ মুড়ি দিলেন আর উঠলেন ভোর সাতটায়।

দিল্লি-কালকা মেল-এ কলকাতা থেকে চণ্ডীগড়—একহাজার চুয়াত্তর মাইল। সোজা কথা নয়—ছত্রিশ ঘণ্টার পথ। পুরো দুটি রাত কাটাতে হবে এই ট্রেন-এ, শীতের কনকনে দুটি রাত।

কোই বাত নেঁহী। প্রথম শ্রেণীর ক্যুপ-এ আমরা প্রাণীও মাত্র দুটি। ঘর-বাড়ির চেয়ে কিছু কম আরামে নেই! সব কিছুই হাতের কাছাকাছি। প্রাতঃকৃত্য থেকে শুরু করে দাড়ি-ফেলা, জিব-ছোলা, পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়া—যা খুশি কর, যখন খুশি কর কেউ তোমায় বিরক্ত করতে আসবে না। মাঝে মাঝে কেবল বেয়ারা এসে উঁকি মেরে জানতে চাইবে—ব্রেক-ফাস্ট চাহিয়ে সাব? খানা? কওন-সা খানা? বেজিটেরিয়ান ইয়া নন বেজিটেরিয়ান?

হুকুমটি দিয়েই তুমি খালাস। নবাবি চাল আর কাকে বলে!

পঞ্জাবে এই প্রথম যাচ্ছি। এর আগেও কয়েকবার গিয়েছি বটে, কিন্তু 'মনসা'।

পঞ্জাব! দ্য ল্যাণ্ড অব দ্য ফাইভ রিভর্‌স্! আবাল্য সাহিত্যে ইতিহাসে যার কথা পড়তে গিয়ে বারবার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছি সেই পঞ্জাব!

জানি স্বপ্নভঙ্গ হবে। ভাবলোক আর বস্তুলোক যে এক নয় সেটুকু বোঝার মতো বয়স হয়েছে। তবু দেহে রোমাঞ্চ লাগে, হৃদয়ে ভাবুকতা জাগে, মন স্বপ্নাবিষ্ট হয়। স্বভাব না যায় মলে। সাধে কি আর শাস্ত্রে বলেছে—যঃ স্বভাবো হি যস্য স্যাৎ তস্যাসৌ দুরতিক্রমঃ। শ্বা যদি—থাক, বাকিটুকু আর বলে কাজ নেই।

পাশের কামরা থেকে রাত চারটের সময় মনিবাবুর ডাক। সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দিলুম—কোথায় এসেছি স্যর ?

—গয়া।

জানালা খুলে দেখি উনি দিব্যি প্ল্যাটফর্ম-এ পায়চারি করছেন। শীতের জামা কাপড় আর কিছুই বাকি নেই। আপাদমস্তক গরম পোশাকে ঢাকা। গলায় গলবন্ধ, মাথায় বিরাটপট্টি। সে এক বিচিত্র বেশ!

—বাইরে খুব শীত বুঝি স্যর ?

—হ্যাঁ, গয়ায় যে এক্সস্ট্রিম ক্লাইমেট!

—এত রাতে বেরিয়েছেন ?

—রাত কোথায়! ভোর হয়ে এল, চারটে বাজে।

—তা বটে! আমার তো এখনো দুচোখের পাতা একই হল না। সারারাত রেলগাড়ির নাগরদোলায় দুলে দুলে ঘুমের দফারফা। চোখ বুজে তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকা আর কি!

অখ্যাত স্টেশন শিউসাগর রোড। মেলগাড়ি দাঁড়াবার কথা নয়, তবু দাঁড়াল। দাঁড়াবি তো দাঁড়া, তার আর নড়চড় নেই। সুযোগ বুঝে আমার ঘুমটা বেশ জুত করে আসছিল মাত্র। কিন্তু এমন সাধনা-লব্ধ বহু প্রতীক্ষিত ঘুমটিও মাটি হল মনিবাবুর পুনরাহ্বানে।

—ও নলিনীবাবু, উঠুন উঠুন!

কোথায় কে নলিনীবাবু ? তিনি তখন ঘুমের অতল সমুদ্রে

সঞ্চরমাণ। মনিবাবু রঙ্গ করে বললেন, কতো আর ঘুমোবে বাছা? ভোর যে হয়ে গেল। ওঠ গোপাল ওঠ।

কি সৌভাগ্য নলিনীবাবুর। এই বয়সেও তাঁর বাল-গোপালত্ব ঘোচেনি। দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম—গাড়ির ঠিক পিছন দিকে পূর্বদিগন্ত জুড়ে নানা রঙের আলপনা! অরুণবরণ পারিজাত নিয়ে বিচিত্র সুন্দরের আবির্ভাব!

কানপুর পর্যন্ত গাড়ি চলল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। আধ ঘণ্টা চলে তো এক ঘণ্টা বিশ্রাম; দুটো স্টেশন পেরিয়ে যায় তো তিনটে স্টেশন জিরিয়ে নেয়। এ কি মেলগাড়ি না ব্যালগাড়ি বোঝা কঠিন।

কানপুর ছেড়ে বুঝতে পারলুম কাকে বলে গতি। গ্যালোপিং স্পিড-এ গাড়ি চলেছে প্রায় ঝড়ের বেগে—গ্রাম-কে-গ্রাম মাঠ-কে-মাঠ পিছনে ফেলে; টানা একশো মাইল। টাইম-টেবল খুলে দেখলুম—হ্যাঁ, প্রায় একশো মাইল পরে এটাওআ।

উত্তর প্রদেশের উর্বর অঞ্চলের মধ্য দিয়ে চলেছি—গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী দো-আব অঞ্চল। সুজলা সুফলা শস্যময়ী প্রকৃতি। যতোদূরে চোখ যায় শুধু সর্শে ফুলের সমারোহ—রাশি রাশি, সারি সারি, অজস্র—আহা, শীতের অলস মধ্যাহ্নে বিশ্রামরতা ধরিত্রীর অঙ্গে যেন বাসন্তী রঙের আঁচলখানি!

চলন্ত গাড়ির সার্শি-আঁটা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে মনে হল—এই বিশাল ভারতবর্ষে আছে কেবল সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর আর সেই প্রান্তরের কোলে কোলে শান্ত সুপ্ত ছোটো ছোটো পল্লি। এদেশে যে কলকাতা-বোম্বাই-মাদ্রাজ নামে জনাকীর্ণ নগরী আছে, আছে বড়ো বড়ো অফিস ও কলকারখানা, আছে শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষ, আছে ভুখা মিছিলের ইনক্লাব-জিন্দাবাদ—

রেলগাড়িতে বসে বাইরের চলচ্চিত্রের দিকে তাকিয়ে সেকথা যেন ভুলেই যেতে হয়।

খুরজা স্টেশন। নৈশভোজন ইতিপূর্বেই শেষ হয়েছে। বেয়ারা এসে তার পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়ে গেল। এবারে আমাদের নিদ্রার আয়োজন। কিন্তু তার আগে চাই কিছু গান। নলিনীবাবুর কণ্ঠে গান লেগেই আছে—রবীন্দ্র সংগীতই বেশি। একে একে গাইলেন অনেকগুলি—

বক্ষে আমার তৃষ্ণা……

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না……

অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়……

গানে গানে আমি কখন ঘুমিয়ে পড়লুম। মনে হল আমি যেন কোথায় তলিয়ে যাচ্ছি—কোন সে অতল? ঘুমের সমুদ্র না গানের সমুদ্র? স্বপ্ন না সংগীত? যেন কতোদূর থেকে ভেসে আসছে অস্ফুট গানের কলি……

মন দেয়া-নেয়ার পাখিরা দুদিনের জন্যে আসে, হাসে ভালোবাসে; বাসা বাঁধে, বেদনায় কাঁদে; ভোলে, ভোলায় আবার শূন্যে ডানা মেলে উড়ে যায়। কেউ তো আমার নয়। আমি বৃথাই চেয়েছি তাদের পুরে রাখতে আমার হৃদয়-পিঞ্জরে, কিন্তু পারিনি। জলপ্রবাহকে কোনোদিন বেঁধে রাখতে পারে কি নদীর তটভূমি! সুরের পাখায় ভর দিয়ে উড়ে চলেছে কবির অপূর্ব বাণী—

নদী তট সম কেবলই বৃথাই
প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই,
একে একে বুকে আঘাত করিয়া
ঢেউগুলি কোথা যায়।

দিল্লি পেরোলেই পঞ্জাব। ভৌগোলিক দৃষ্টিতে অবশ্য দিল্লি পঞ্জাবেরই অন্তর্ভুক্ত, কেননা যমুনা নদীর প্রবাহ পঞ্জাবের পূর্বসীমা এবং দিল্লি যমুনার পশ্চিমতটে।

রাত বারোটা। চোখের সামনে থেকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দিল্লি! জানলা দরজা বন্ধ করে মুড়িশুড়ি দিয়ে আবার লেপের নিচে অন্তর্ধান করলুম। একে একে পার হয়ে এলুম পানিপথ কর্নাল ও কুরুক্ষেত্র—ইতিহাস ও পুরাণের স্মৃতি-বিজড়িত পুণ্যস্থানগুলি।

ভোর রাতে গাড়ি এসে দাঁড়াল আম্বালায়। প্ল্যাটফর্ম থেকে কে আমার নাম ধরে ডাকছে না? উৎকর্ণ হয়ে রইলুম। হ্যাঁ আমারই নাম তো বটে! এখানে এমনভাবে আমায় কে ডাকবে? দরজা খুলেই দেখি—চণ্ডীগড়ের বন্ধু। আম্বালায় এসেছে আমায় স্বাগত করতে। একটু সংকুচিত হলাম, কী প্রয়োজন ছিল এই কষ্ট-স্বীকারের!

—বাঃ তুমি এলে হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে, আর আমি আসতে পারব না ত্রিশ মাইল এগিয়ে!

বন্ধু বটে! এহেন বন্ধুর আহ্বানে অকালে যাত্রাভঙ্গ হল অস্থানে।

আম্বালা ছাউনি। বেশ বড়ো স্টেশন। দিল্লি থেকে রেলপথ এখানে এসে দ্বিধাবিভক্ত—উত্তর পশ্চিমে চলে গেছে মেইন লাইন লুধিয়ানা-জালন্ধর-অমৃতসর-পাঠানকোট। আর সোজা উত্তরে প্রসারিত চণ্ডীগড়-কালকা-সোলন ও শিমলা। এই দুই পথের মাঝখানে আম্বালা যেন সেন্টিনেল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

প্ল্যাটফর্ম-এ নামতেই বন্ধুবর আমার গায়ে চাপিয়ে দিলে তার বিশাল ওভারকোট। ওরে বাবা, এর ওজন বহন করাই যে দুঃসাধ্য আমার পক্ষে। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ক্ষীণজীবি বাঙ্গালি আমি! কিন্তু উপায় কী! যা শীত!

মালপত্র সামান্যই, কিন্তু শীতবস্ত্রের বাহুল্যে আমরা দুজনেই এতো স্ফীতকায় যে, একটি রিকশায় আর কুলোচ্ছে না। কোনোক্রমে ত্রিভঙ্গ-মুরারি হয়ে বসা গেল।

—এ কি ভাই, তোমাদের আম্বালাকে তো আধুনিকা বলেই জানতুম, তবে পরদেশী দেখে এ অবগুণ্ঠন কেন?

বন্ধুবর আশ্বাস দিয়ে বললে—খুলবে খুলবে, তোমার প্রেমের সূর্যে এর ঘোমটার কুয়াসা কতোক্ষণ?

লামলি হাউজ। মৃত ইউ. পি. আই-র প্রাক্তন বাসস্থান। ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হলেও বন্ধুর পাততাড়ি গুটোনো এখনো হয়নি। ৩০শে সেপ্টেম্বর মধ্যরাতে কেন্দ্রীয় সরকার টেলিপ্রিণ্টারের লাইন কেটে দিয়েছেন বটে, কিন্তু এখনো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ইউ. পি. আই-র কাগজপত্র যন্ত্রপাতি।

চুলোয় যাক ইউ. পি. আই। আমি ভাবছি—এলুম কোন দেশে? বাংলাদেশের মতোই তো সমতল, তবে দাঁতে দাঁত লাগছে কেন? হাতের আঙ্গুলগুলো যে অসাড় হয়ে যাচ্ছে। বাড়িতে একটা পৌঁছ সংবাদ দেওয়া দরকার, কিন্তু একি! কলম যে খসে পড়ছে হাত থেকে!

ইতিমধ্যেই আলাপ হল ছোটো বড়ো অনেকের সঙ্গে। বন্ধুবর সাংবাদিক; তাই তার আগমন সংবাদে পরিচিত অনেকেই এসেছেন দেখা করতে। শুরু হল আমার হিন্দী জ্ঞানের পরীক্ষা। মরি কি বাঁচি করে আলাপ চালাতে হল রাষ্ট্রভাষায়, নাই বা হল কর্তা-ক্রিয়ার লিঙ্গ-সমতা।

ঘুরে ঘুরে দেখা হল শহরটা। ক্যান্টনমেণ্ট এলাকা। অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ইতস্তত ছড়ানো শহর। চওড়া রাস্তার মধ্যবর্তী অংশটুকু মেটালড, দুটি ধার ধূলি-ধূসর। গরমের দিনে এই ধুলোর ঝড় যে কী ভীষণ দুর্যোগের সৃষ্টি করে তা কল্পনা করা কিছু কঠিন নয়।

বেলা এগারোটা। কুয়াসার ঘোর তখনো কাটেনি। জনবিরল পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াই। বন্ধু চিনিয়ে দিচ্ছে—এই পি. টি. আই অফিস। আর সামনে ওই যে বাড়িটি দেখছ ওখান থেকে প্রকাশিত হয় ট্রিবিউন—পাঞ্জাবের একমাত্র ইংরেজি দৈনিক—আমার বর্তমান অন্নদাতা। চল মিঃ বালির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

—বালি ? কে তিনি ?

—নিউজ এডিটর !

—যাক বাবা, বাঁচালে। আমি ভেবেছিলুম, সুগ্রীবের সহোদর।

বালিজির সঙ্গে আলাপ করে খুশি হওয়া গেল। বছর পঞ্চাশেক বয়স, সৌম্য সুন্দর স্বাস্থ্যবান চেহারা। পঞ্জাবে ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা, বিধান পরিষদের সদস্য, পঞ্জাব সাংবাদিক সংঘের সভাপতি।

ট্রিবিউন প্রসঙ্গে মনে পড়ল বাঙ্গালি সম্পাদক কালীনাথ রায়ের কথা। দীর্ঘকাল তিনি যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদন করেছেন কাগজখানি, তখন এর কার্যালয় ছিল লাহোর।

আম্বালার অন্যতম কৃতী বাঙ্গালি সন্তান শ্রীযুক্ত ক্ষিতিন সেন। কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের পুত্র। হিন্দুস্থান বিমা কোম্পানির স্থানীয় কর্মাধ্যক্ষ। শান্তশিষ্ট মানুষটি। একটি চুল পড়েনি, একটি চুল পাকেনি। বয়সকে ধরে রাখার কৌশল আয়ত্ত করেছেন ভদ্রলোক।

চলতে চলতে বন্ধু একসময়ে বললে—আলাপ করবে মিসেস এণ্ডরুজের সঙ্গে ?

অসহায়ভাবে উত্তর দিলুম—আর তো পারছি না ভাই, পালা করে এই হিন্দি-বাংলা-ইংরেজির বুকনি। মাথা যে ঝিমঝিম করে।

কিন্তু ততোক্ষণে বন্ধুর ডাকে বেরিয়ে এসেছেন মিসেস এণ্ডরুজ। মেমসাহেবের মতোই চলন-চলন, ইংরেজিও বলেন মিস্টিমিস্টি। পুত্র-কন্যা সকলেই ইংরেজি কায়দায় দুরুস্ত।

পরে জানলুম মহিলা ইংরেজ নন, দেশীয় খৃশ্চিয়ান। কোন দেশীয় বলা কঠিন, কারণ এণ্ডরুজ-দম্পতির কুলজি-বিচার করতে গেলে বাঙ্গালি থেকে পারসি অনেক নাম বেরিয়ে পড়বে। এমনকি কোনো পুরুষে এক-আধটা বিলিতি নাম পাওয়াও বিচিত্র নয়। মিসেস এণ্ডরুজ-এর মেয়েরা কেউ হয়েছেন মিসেস মেনন, কেউ বা মিসেস মুখার্জি। অনূঢ়াটি কি হবেন একমাত্র প্রজাপতিই বলতে পারেন। আলডু হাক্সলি কল্পিত Barve New World-এর আদিমতম বাসিন্দা এঁরা।

ফিরে এসে আলাপ হল ডাক্তার বোসের সঙ্গে। বোস-গিন্নিকে এরা সকলেই মাসিমা বলে ডাকে, সুতরাং তিনি আমারও মাসিমা। আমার অদ্যকার মধ্যাহ্ন ভোজন তাঁরই গৃহে। খেতে বসেছি—পোলাও মাংস আলু-কপির তরকারি, চাটনি ও মিস্টি। উৎকৃষ্ট রান্নায় ভুরিভোজনের ব্যবস্থা। এতোক্ষণ উদর-দেবতার সেবায় এতোই ব্যস্ত ছিলুম যে কোনোদিকে তাকাবার অবকাশ হয়নি। হাতমুখ ধুয়ে ঢেকুর তুলে যখন পানটি নিতে গেলাম তখনই ভালো করে দেখলাম মাসিমাকে। সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী প্রৌঢ়া প্রবাসী বাঙ্গালি গৃহিণী। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলুম তাঁর দিকে—প্রায় অভব্যের মতো।

সন্ধ্যার পরে আম্বালা থেকে শাট্‌ল্ ট্রেন-এ চণ্ডীগড়। এই চণ্ডীগড়! ভুল হচ্ছে না তো? ছোটোখাটো একটি মফস্‌সল স্টেশনের মতো কয়েকটি ক্ষীণ দীপশিখা জ্বালিয়ে চণ্ডীগড় যেন শবরীর প্রতীক্ষায় রত। কবে আসবে ভারতের দিগদিগন্ত হতে হাজার হাজার মানুষের মিছিল, নানা ধর্মের নানা বর্ণের, নানা পেশার নানা নেশার, গুণীজন হরিজন মহাজন। সেই বিপুল মানবস্রোতের প্রাণস্পর্শে চণ্ডীগড় একদিন ধন্য হয়ে উঠবে।

আপাতত তার অবস্থা বড়োই শোচনীয়, গাড়ি থেকে নামলুম আমরা সামান্য ক টি যাত্রী। সন্ধ্যা সাড়ে-সাতটাতেই মনে হল গভীর নিশুতিরাত। একখানি মাত্র প্ল্যাটফর্ম—আপ ও ডাউন গাড়ি এই একই প্ল্যাটফর্ম-এ এসে দাঁড়ায়। চারিদিকে জনবসতিহীন বিরাট প্রান্তর।

এই প্রান্তরের বুকে সভ্যতার ফুল ফোটাবে পঞ্জাব সরকার। এই ধ্যাদ্‌দেড়ে গোবিন্দপুরে গড়ে উঠবে Garden City of India?

স্টেশনের বাইরে এলাম। একখানি বাস এবং খানকয়েক সাইকেল-রিকশা দাঁড়িয়ে আছে সমাগত যাত্রিদের জন্য। মনে পড়ল কলকাতার কথা। তুলনা করছি না, কারণ এই দুয়ের তুলনা হয় না। একটি ডেড সিটি, অপরটি সদ্যোজাত শিশু। প্রথমটি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দিবসের মরীচিকা, রাত্রির দুঃস্বপ্ন; দ্বিতীয়টি Symbolic of the freedom of India unfettered by the traditions of the past (নেহরু)। কলকাতার আছে ঐশ্বর্যময় অতীত, চণ্ডীগড়ের সামনে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত।

স্টেশন থেকে শহর অনেকদূরে। শূন্য মাঠের উপর দিয়ে বাস চলেছে। নামল বৃষ্টি। আহা, বৃষ্টি তো নয়, যেন আকাশ থেকে ডেলিগেটদের উদ্দেশ্যে দেবলোকের পুষ্পাঞ্জলি। তা হোক, কিন্তু বাস-এর ছাদে বিছানা ও বাক্স-পেটরার যে কি সদগতি হচ্ছে তাই ভাবছি।

বাস লোকালয় প্রবেশ করছে, তার মানে এখান থেকেই শহরের সূচনা। গাড়ি কখনো ডাইনে কখনো বাঁয়ে সমকোণ সৃষ্টি করে এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে বাড়িঘর দোকানপাট লোকজন বিজলীবাতি, আবার পরক্ষণেই গাঢ় অন্ধকার, আবার লোকালয়।

বন্ধু অনুক্ষণ বোঝাবার চেষ্টা করছিল চণ্ডীগড়ের মহিমা। দেশ বিভাগের পরে সমগ্র পূর্ব-পঞ্জাব হয়ে পড়ল উদ্বাস্তুর দেশ। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তুলনাই হয় না। আমাদের কলকাতা যেমন ছিল তেমনই আছে, শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতির পীঠস্থান বিশ্ব-বিদ্যালয়কেও হারাতে হয়নি। কিন্তু পূর্ব-পঞ্জাবে না ছিল বিশ্ববিদ্যালয়, না ছিল রাজধানী। পশ্চিমবঙ্গে রেফ্যুজিদের জন্যে হয়েছে সরকারি ক্যাম্প, আর পঞ্জাবে খুদ সরকারকেই হতে হয়েছিল ক্যাম্প-এর রেফ্যুজি!

কী ছিল এই চণ্ডীগড়? সামান্য একখানি গ্রাম। কলকাতা সুতানুটি গোবিন্দপুরও নয়। মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে একটি নির্জন প্রান্তর কর্ম-চাঞ্চল্যে মুখর হয়ে উঠেছে। আজ—ভাবাবেগে বন্ধুর মুখ থেকে নেহরুর ভঙ্গিতে বিদেশী বুলি বেরিয়ে এল—Chandigarh is the pride of the Punjab and the rest of India.

যে চণ্ডীর রুদ্ররোষে ছারখার হল পঞ্জাব, সেই চণ্ডীদেবীর পদপ্রান্তেই নতুন রাজধানী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হল ১৯৪৮

সালের গোড়ায়। কাজ আরম্ভ হয় ঠিক দু-বছর পরে। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ আনুষ্ঠানিকভাবে রাজধানীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন ১৯৫৩ সালের ৭ই অক্টোবর। বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে সরকারি দপ্তরগুলো তুলে আনা হল এখানে। ১৯৫৫ সালের জানুয়ারি থেকে শুরু হয় হাইকোর্টের কাজ। ইতিমধ্যেই পঞ্জাবের সমস্ত অঞ্চল তথা দিল্লির সঙ্গে চণ্ডীগড়ের যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং ১৯?৪ সালে রেলপথের মানচিত্রেও যুক্ত করা হল চণ্ডীগড়কে। Now all Roads lead to Chandigarh.

চণ্ডীগড়ের রিপোর্ট-রচনায় সাংবাদিক বন্ধু একেবারে পঞ্চমুখ। কিন্তু আমার কান তো দুটোই।

ততোক্ষণে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে বাইশ নম্বর সেক্টর-এ, আমাদের গন্তব্যস্থলে। বাপস্, বাঁচা গেল। চণ্ডীগড়ের মহিমা-কীর্তন রেডিও-র চণ্ডীপাঠ অপেক্ষাও ভয়াবহ।

—এই আমার ডেরা।

সহসা একটা জায়গায় থেমে বন্ধু ইঙ্গিতে জানাল। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কাঁপছি হিহি করে। তবু একবার চোখ বুলিয়ে নিলুম চারিদিকে। সামনেই আলোকোজ্জ্বল কিরণ সিনেমা—শহরের একমাত্র প্রমোদভবন। অদূরে নব-নির্মিত বিপণি-মালা—কোয়ালিটি, অন্নপূর্ণা এবং সারি সারি আরও অনেক।

ভিতরে প্রবেশের মুখে চোখে পড়ল ইংরেজিতে লেখা—৪। ও হ্যাঁ! 9FB/8 Sector 22/A—এই তো ছিল ঠিকানা। কি বিদ্‌ঘুটে ঠিকানারে বাবা! কলকাতায় মানুষকে খুঁজে পেতে হয় রাস্তার নাম ও নম্বর ধরে—উলিউল্লা লেন, ধনদা ঘোষ স্ট্রিট,

আগুশ্রাদ্ধ রোড। কিন্তু এখানে রাস্তার কোনো নাম নেই। সকলই জাতিবাচক বিশেষ্য, একটাও ব্যক্তিবাচক নয়।

রাত এগারোটা। নৈশ ভোজনান্তে চারপাই-এর ওপর চিত হয়ে শুয়ে বন্ধুর মুখ থেকে শুনছি চণ্ডীগড়ের প্ল্যানিং-তত্ত্ব। এইটেই নাকি এখানকার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য। বোম্বে বল, মাদ্রাজ বল, কলকাতা বল—কোথাও প্ল্যানিং-এর বালাই নেই। এলোপাথাড়ি গড়ে উঠেছে ভারতের শহরগুলি। একমাত্র জয়পুরকে বাদ দিলে চণ্ডীগড় ভারতবর্ষে অদ্বিতীয়।

ত্রিশটি সমায়তন সেক্টর নিয়ে সমগ্র শহরটির পরিকল্পনা। প্রতিটি সেক্টর-এ লোকসংখ্যা থাকবে কম-বেশি পনেরো হাজার। শহরের উত্তরতম প্রান্তে সবার আগে ১ নম্বর সেক্টর—যেখানে রাজভবন, হাইকোর্ট, এসেম্বলি ও সেক্রেটারিয়েট। ৩, ৪ ও ৫ নম্বর সেক্টর হচ্ছে জজ-ব্যারিস্টার, মন্ত্রী-উপমন্ত্রী এবং পরিষদ সদস্যদের বাসভূমি। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারিদের নন্দন-কানন হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে ১৬ নম্বর সেক্টর। এইভাবে সমগ্র চণ্ডীগড়—স্বাধীন ভারতের প্রথম পরিকল্পিত মহানগরী—একটি চমৎকার সেক্টরিয়ান রূপ নিচ্ছে এবং সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজগঠনের দিকে মহামান্য নেহরু-সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ঘোষণা করছে!

আসলে চণ্ডীগড় একটি আমলাতান্ত্রিক শহর মাত্র। সরকারি প্রচারকার্যের দৌলতে চণ্ডীগড় সারা ভারতবর্ষে যে পরিমাণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, খাস পঞ্জাবে তার সিকি ভাগও সাড়া জাগাতে পারেনি। প্রথম কারণ, রাজধানীর স্থান নির্বাচনে ত্রুটি। পঞ্জাবের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ঘেঁষে চণ্ডীগড় সামান্য একটি বিন্দু—যে বিন্দুটি মানচিত্র থেকে মুছে গেলেও পাঞ্জাবের সাধারণ অধিবাসীর কিছুমাত্র যায় আসে না। তারা জলন্ধর-লুধিয়ানা-

পটিঅলা-অমৃতসরকে জানে, চণ্ডীগড়কে চেনে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকেও পঞ্জাবের জন-জীবনে চণ্ডীগড় কোনো নব-কল্যাণের বার্তা নিয়ে আসেনি। চণ্ডীগড় তাই অকল্যাণী অর্থাৎ পশ্চিমবাংলার কল্যাণী।

সাধারণ মানুষের জন্য না হোক, সরকারি কর্মচারির পক্ষে চণ্ডীগড় রামরাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে মূর্খ পিওন পর্যন্ত কর্মচারিদের পদমর্যাদা অনুযায়ী পঞ্জাব সরকার তেরো রকমের বাড়ি নির্মাণ করেছেন। বাড়িগুলির নির্মাণ-মূল্য নিচে আড়াই হাজার, উপরে আড়াই লাখ। আমার বর্তমান আবাস চোদ্দহাজারি বাড়িতে। নিম্নতম গেজেটেড অফিসার—যাঁদের মৌলিক মাসিক বেতন আড়াই শো থেকে পাঁচশো তাঁদেরই জন্য তৈরি হয়েছে এই নবম শ্রেণীর বাড়িগুলি। তাই ঠিকানার প্রথমেই ইংরেজি সংখ্যা—'9'।

প্রতিটি বাড়ি দ্বিতল। আনুমানিক তিন কাঠার উপর নির্মিত। উপরে তিনখানা শয়নঘর, দুটি বারান্দা, স্নানাগার, শৌচাগার; নিচে প্রশস্ত ড্রয়িং-রুম, ডাইনিং-রুম, কিচেন ও ভাঁড়ার ঘর। সামনে একটু লন-ও আছে। ভাড়া সরকারি কর্মচারির পক্ষে বেতনের দশমাংশ অর্থাৎ পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ। কিন্তু সরকারি কর্মচারির তুলনায় বাড়ির সংখ্যা বেশি বলে উদ্‌বৃত্ত বাড়িগুলি বে-সরকারি লোককেও ভাড়া দেওয়া হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে দু-রকমের ভাড়া চালু আছে। ইকনমি রেণ্ট প্রায় দেড়শো টাকা আর স্ট্যাণ্ডার্ড রেণ্ট সাতাশি। বন্ধুবর ট্রিবিউন-এর বিশেষ পত্রকার (special correspondent) বলে শেষ ক্যাটিগরির অন্তর্ভুক্ত।

—ঘুমোচ্ছ নাকি?

তন্দ্রালুতার হাই তুলে মুখের সামনে তুড়ি দিতে দিতে

বললুম—না, ঘুমোতে আর দিলে কই? তোমার প্ল্যানিং-তত্ত্বামৃত শ্রবণে জীবন ধন্য করছিলুম। তারপরে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে বন্ধুকে শুধোলাম—একটা কথা বলতে পার, এ ধরণের প্ল্যানিং দিয়ে হবেটা কী? একেই তো আমাদের জীবনে নাটকীয় বৈচিত্র্য নেই বললেই চলে। প্ল্যানিং-হীনতার ফলে যেটুকু বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা থাকে, চণ্ডীগড় তারও দফা নিকেশ করেছে। এর চেয়ে কলকাতা ঢের বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ। সেখানে কোনো প্রাসাদ-নন্দিনী অনায়াসে মাল্যদান করতে পারে গাড়ার কোনো মধ্যবিত্ত বেকার যুবকের গলায়। আবার কোনো সহৃদয় ধনীর দুলাল চাই কি জীবন-সঙ্গিনী করে নিতে পারে প্রতিবেশির দুঃস্থা কন্যাকে। জীবনের এই উপাদান নিয়েই তো নাটক-নভেল যা কিছু, এই নিয়েই তো চিনিমা। আর তোমাদের এখানে? দুয়ো! দুয়ো!

২৭শে ডিসেম্বর সকাল দশটা। বন্ধুবর দাড়ি কামাতে কামাতে অকস্মাৎ জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হঠাৎ উচ্চকাণ্ঠে হাঁক দিলে—কাপুর অ্যায় কাপুর, জাতে ওয়কৃত্ মুজে লে জানা। কাপুর···

লেপের মধ্য থেকে মুখ বাড়িয়ে বিরক্তকণ্ঠে বললুম—এই সাত সকালে কোথায় কালীতারা মহাবিদ্যার নাম নেবে, তা নয় কাপুর কাপুর বলে চেঁচাচ্ছ! কে হে কাপুর? রাজকাপুরের কেউ হন নাকি?

—না, হিন্দুস্থান টাইমস্-এর স্পেশাল করেস্পণ্ডেণ্ট। ওর গাড়ি আছে, তাই বলে দিলুম আমাদের নিয়ে যেতে।'

খানিক পরেই কাপুর এল তার গাড়ি নিয়ে।

—ইনিই মিঃ কাপুর। অর ইয়ে মেরে দোস্ত কলকত্তেসে আয়ে হুয়ে হ্যাঁয়।

—কলকত্তেসে? কহিয়ে ক্যা হাল হ্যায় কলকত্তেকা।—বলেই মুখ উঁচিয়ে একরাশ ধোঁয়া। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

শ্রীমান কাপুর একটি দর্শনীয় জীব। ছিপছিপে চেহারা—প্রায় তালপাতার সেপাই বলা চলে। দেহ থেকে মাথাটি অস্বাভাবিক রকমে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া, যেন সর্বদাই জীবনের মজা খুঁজে বেড়াচ্ছে। বাপ বড়োলোক। সুতরাং ঘরের চিন্তা কী! তাই চাকরির নাম করে বারকয়েক সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছে। চোখে মুখে বহু ঘাটে জল খাওয়ার চিহ্ন পরিস্ফুট।

—কাপুর সাঁভালকে চালানা।

কাপুরের ড্রাইভিং দেখে মনে হয় সামনে তার সবই রাস্তা এবং সে রাস্তা বিলকুল ফাঁকা। স্টিয়ারিং-এ একটা হাত আছে কি নেই, গাড়িতে ফুল স্পিড দিয়ে শ্রীমান পিছন ফিরে সমানে গল্প করে চলেছে আমাদের সঙ্গে! কি সর্বনাশ! নরসভার পরিবর্তে শেষ পর্যন্ত একেবারে দেবসভায় গিয়ে না পৌঁছুই!

দুর্গানাম জপতে জপতে কোনোক্রমে সম্মেলন শিবিরে আসা গেল। সুবৃহৎ প্যাণ্ডেল। অনেক আসনই খালি পড়ে আছে। প্রতিনিধির সংখ্যা আর কতো! বড়ো জোর চোদ্দশো। এখানে সেখানে চুইয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির জল। পঞ্জাবে যে বর্ষাকালে বৃষ্টি হয় না, বৃষ্টি হয় শীতকালে এ তথ্য তো জেনে শুনেই এসেছি। সুতরাং ও নিয়ে মন খারাপ করে লাভ নেই। তার চেয়ে সম্মেলনের প্রোগ্রামের উপর একবার ভালো করে চোখ বুলিয়ে নেয়া যাক।

ঠিক এগারোটার সময় এলেন মহামান্য নরহরি বিষ্ণু গ্যাডগিল—পঞ্জাবের গভর্নর। শিক্ষামন্ত্রী অমরনাথ বিদ্যালঙ্কার

দিলেন স্বাগত ভাষণ, তারপরে গ্যাডগিল সাহেবের উদ্বোধনী বক্তৃতা। কিন্তু ইতিমধ্যে আকাশেও এসে জমা হয়েছে নানা রাজ্যের বিস্তর প্রতিনিধি এবং খানিক যেতে না যেতেই শুরু হল রিমঝিম রিমঝিম। মঞ্চের উপর গ্যাডগিলের কণ্ঠ, মাথার উপর বর্ষার জলতরঙ্গ—বেশ একটা মধুর ঐকতানে মন নিবিষ্ট হয়ে গেল।

সাধারণত যা হয়, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। উদ্বোধনী বৈঠকের পরেই সম্মেলনের গুরুত্ব গেল কমে। ভি. আই. পি-রা সব চলে গেলেন, চলে গেলেন তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গের দল। প্রতিনিধিরা দলে দলে বেরিয়ে পড়লেন সাইট-সিইং-এর উদ্দেশ্যে। বস্তুত এটাও সম্মেলনের অন্যতম কর্মসূচী, অনেকের মতে প্রধানতম। চণ্ডীগড়েই যখন আসা হল সেই সুযোগে যদি পঞ্জাবটাও দেখে যাওয়া যায় তো মন্দ কি? অমৃতসর ভাক্রানাঙ্গল তো আছেই। শিমলায় নাকি বরফ পড়েছে, তবে সেটাই বা বাদ যায় কেন? দিল্লিতে এগজিবিশন হচ্ছে—নাও ওটাকে ইনক্লুড় করে। আগ্রার তাজমহল বার কয়েক দেখা আছে বটে, কিন্তু সামনেই তো পূর্ণিমা—সুতরাং এ সুযোগ ছাড়া যায় না। তারপরে রাজস্থানের ঐতিহাসিক নগরী ও অপূর্ব দৃশ্যাবলি। সামান্য একটু ঘুরে গেলে যদি ওগুলোও দেখা যায় তো ক্ষতি কী! আর এতো কাছেই যখন আসা হল, তখন হরিদ্বারে গিয়ে তীর্থটা না-করা কোনো কাজের কথা নয়। শেষ পর্যন্ত সব কিছুই দেখা হয়, কিন্তু প্যাণ্ডালটাই বাদ যায়। কাশী গিয়ে সবই তো হল, কিন্তু বিশ্বনাথ দেখলুম কই!

নিষ্ঠা নিয়ে সম্মেলনে আসেন একমাত্র রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়। তাঁরা একসঙ্গে চলেন, একসঙ্গে বসেন এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি বৈঠকে সোৎসাহে যোগদান করেন।

চারদিন ব্যাপী সম্মেলন। কিন্তু প্রথম দিনের পরেই ভাঙা হাট। যাঁরা ঝরতি-পড়তি পড়ে থাকেন, তাঁরাও আবার বিভক্ত হয়ে যান বিভিন্ন বিভাগীয় সম্মেলন অর্থাৎ Sectional Conference-এ তখন সভার যা অবস্থা দাঁড়ায় তার কথা বহু পূর্বেই ক্রান্তদর্শী শাস্ত্রকার বলে গেছেন—বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ।

দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে ছিল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-সংক্রান্ত আলোচনা বাসর। গিয়ে দেখি ছোট্ট একটি ঘরে জনকয়েক শান্তশিষ্ট নিরীহ নরনারী বসে আছেন। আমাদের ট্যুটোরিয়ল ক্লাস থেকেও ছোটো। গেলোবারের মতো এবারেও অধ্যক্ষ অরুণ সেন লিডার। চেয়ার টানছেন, আদর অভ্যর্থনা করছেন আবার সহাস্য আননে বক্তৃতাও দিচ্ছেন। সভাপতি ছিলেন তুতিকোরিন চিদম্বরম কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীনিবাস রাঘবন। কিন্তু অরুণবাবু একাই একশো। বিশাল বপু নিয়েও তিনি প্রমূর্ত উৎসাহ।

পরদিন সন্ধ্যায় মাইকের সামনে উঠে দাঁড়িয়েছেন রাঁচির অধ্যাপিকা রেভারেণ্ড মাদার জেভিয়ার। শ্বেতবরণা শ্বেতবসনা বক্ষোপরি ক্রুশচিহ্নবাহিনী দীর্ঘাঙ্গী খ্রিস্টিয় সন্ন্যাসিনী। বেশ একটা মোহময় পরিবেশ। কিন্তু সব মাটি করে দিল তাঁর হাতের এক তাড়া কাগজ। শ্রোতৃ-সমাবেশ আস্তে আস্তে পাতলা হতে থাকে। বিশুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণও তাদের ধরে রাখতে পারে না। কোথাও ভদ্রমহিলার নিজের কথা নেই, এতোটুকু প্রাণের স্পর্শ নেই। একেবারে অবজেকটিভ আলোচনা। প্রায় প্রতিটি বাক্যের প্রারম্ভে অমুক উবাচ, অ্যাকর্ডিং টু হিম অথবা তার সমার্থক শব্দাবলি। এরই নাম পেপার-পড়া।

নিমীলিত নয়নে শুনতে শুনতে মনে মনে সাইট-সিঅরদের বুদ্ধিমত্তার তারিফ করছিলুম।

সম্মেলনের শেষটা একেবারেই ঝুলে পড়ল—বাংলা নাটকের ক্যাটাসট্রফির মতো। তখনকার প্রধান কার্যসূচী ছিল বিভিন্ন বিভাগীয় আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ—Reading of Sectional Conference Reports। বছর বছর সেকশনের সংখ্যা বেড়ে বেড়ে এবারে প্রায় দু-ডজনে এসে দাঁড়িয়েছে—প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা কালেজিয় শিক্ষা, বয়স্কদের শিক্ষা, শিশুশিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, স্ত্রী শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা, আদিবাসিদের শিক্ষা, প্রাচ্য-শাস্ত্র শিক্ষা, যুবকল্যাণ শিক্ষা·—এই শিক্ষা কল্পদ্রুমের বিবরণ যিনি ধৈর্য ধরে শুনতে পারেন তাঁকে অবশ্যই পদ্ম-বিভূষণে ভূষিত করা উচিত।

সর্বশেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—মূল সম্মেলনের রসহীন মরুভূমিতে যেন মরূদ্যানের বার্তা এল। হিন্দি-উর্দু-পঞ্জাবি-ইংরেজি—চারটি ভাষার প্রোগ্রাম। লোহড়ি-ভাঙড়া-গিদধা-তিরঞ্জন—এই কটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পঞ্জাবকে পাওয়া গেল খুব ঘনিষ্ঠভাবে।

লোহড়ি পঞ্জাবের একটি প্রধান জাতীয় উৎসব। পউস মাসের সংক্রান্তির সন্ধ্যায়—যখন শীত একেবারে চরমে ওঠে—এই উৎসবের ধুম পড়ে যায় পঞ্জাবের গ্রামে গ্রামে। দিন কয়েক আগে থেকেই ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা ভিক্ষায় বেরিয়ে পড়ে দলে দলে। সন্ধ্যার পরে প্রতিবেশী গৃহস্থের বাড়ি গিয়ে তারা ছড়া শুনিয়ে ভিক্ষা নিয়ে আসে—

ঘেরণী! মেরী রঙ্গ-বিরঙ্গী ঘেরণী!
চুহি আঁ দে ঘর বিল্লী টঙ্গী ঘেরণী।
লিআ মাঙ্গ লক্‌কড়ী-লিআ মাঙ্গ গোহা
মাঙ্গ দাঁ বচড়া নওয়াঁ নরোআ।

কেউ এনে দেয় কাঠ, কেউ দেয় ঘুঁটে, কেউ বা পয়সা। তারপরে উৎসবের সন্ধ্যায় সংগৃহীত কাঠ ও ঘুঁটে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে তার চারিদিকে বসে যায় ছেলে বুড়ো সবাই। ছেলেদের মুখ খুশিতে ঝলমল, বুড়োদের মুখে সুখদুঃখের কথা, সকলের হাতে হাতে রেওড়ি—লোহড়ি উৎসবের প্রধান মিঠাই।

ভাঙড়া পঞ্জাবের একটি বিশিষ্ট লোকনৃত্য। চৈত্র-বৈশাখে গেহুঁ-বাজরা ঘরে তোলার পরে কিসানের জীবনে জেগে ওঠে খুশির লহর। কণ্ঠে সুরের হিল্লোল, চরণে গতির ক্ষিপ্রতা। পরনে লুঙ্গি, মাথায় পাগড়ি, গায়ে কুরতা, হাতে দেহাতি বাদ্য—ব্যস শুরু হয়ে যায় উদ্দাম ভাঙড়া নাচ—

দিন চড়দে দী লালী রূপ কুআরী দা।
খণ্ড্ মিশ্‌রী দীআঁ ডলীআঁ রূপ কুআরী দা।
ওগো মেয়ে, তোমার রূপে যে ঐ ভোরের আলোর আভা।
ওগো মেয়ে, তোমার রূপে যে ঐ মিশ্রি-চাকার মাধুরী।

পঞ্জাবি মেয়েও চুপ করে থাকার পাত্রী নয়, মুখে তার তুরুক-জবাব—

জদোঁ রঙ্গসী গুলাবী ফুল ওয়রগা
উদোঁ কিউ না আয়োঁ মিতরা ?
বন্ধু, তুমি তখন কেন এলে না
যখন রঙ ছিল মোর গোলাপের মতো রাঙা ?

উত্তরের প্রত্যুত্তরও আছে, কিন্তু সে সব কথায় আপাতত আমাদের প্রয়োজন নেই।

আমি শুধু ভাবছি—পঞ্জাবের জন-জীবনে ভাঙড়ার স্থান কতোখানি! বাঙালির কীর্তন, পঞ্জাবির ভাঙড়া। কীর্তনিয়া যখন বাহু তুলে মাথুর পালায় তান ধরেন—সখি হে, তখন চোখের জলে বুক ভেসে যায় বাঙালির। আর যখন ঢুনি চালে

তালে তালে জমে ওঠে ভাঙড়ার দ্রুত পদক্ষেপ, তখন হৈ হৈ করে মেতে ওঠে পঞ্চনদের সন্তানেরা! কী ভিগরাস সেই উন্মাদনা! গোটা প্যাণ্ডেল শুদ্ধ শুরু হয়ে যায় নৃত্যগীতের উৎসব। মনে মনে ভাবি--হ্যাঁ, একটা জাত বটে। নাচ তো নয়, যেন প্রচণ্ড প্রাণশক্তির ঘূর্ণাবর্ত। পুরুষদের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম। কিন্তু মেয়েরা! কোমল তনুলতায় এমন নাচও কি সম্ভব! দোদুল দোলের ভঙ্গি নয়, রীতিমত রণং দেহি ভাব। অথচ প্রতিটি মুদ্রায় ছন্দের সুষমা, লীলায়িত ভঙ্গিমা। ভাঙড়ার মধ্য দিয়ে পঞ্জাবি মেয়েরা মুঠো মুঠো ছড়িয়ে দিল অমিত প্রাণের লীলা।

কিন্তু ওদের সত্যিকারের নাচ হল—গিদধা। প্রাণভরে ওরা ভালবাসে সেই নাচ।—

ও গিদধা, ওগো গিধিয়া, তুমি অমন করে যেওনা গো চলে, তুমি এস মোদের গাঁয়ে। শাওন মাসে ঘাস হয়েছে মাঠে, কেমন নরম সবুজ ঘাস। ও গিদধা, ওগো গিধিয়া, তুমি এস মোদের গাঁয়ে।—এমনি করে শুরু হয় গিদধা নাচের পালা।

পর্দা উঠতেই দেখা গেল—ঘাঘরা-কুর্তা-দুপট্টা পরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দশ বারোটি মেয়ে। মেয়ে তো নয়, যেন নানা রঙের মেলা। ঢোলকে ঘা পড়তেই ঘুরে ঘুরে শুরু হল তালি-বাজানো নৃত্য—যেন ইন্দ্রধনুর রঙ বদলের খেলা। নাচের তালে তালে গান, গানের তালে তালে তালি—দশ বারো জোড়া কোমল হাতের মিঠে তালি—

হুসন গোরী দা চো চো প্যায়ন্দা
জিউঁ গন্নেদী পোরী দা।
ভরী সুলাঈ ন্যায়নী পাঈ
লপ কু সুর্মা লোড়ী দা॥

ঐ যে ফর্সা রঙের মেয়ে, ওর দেহ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে টাটকা তরল রূপ, যেন কাটা আখের রস—

হুসন গোরী দা চো চো প্যায়ন্দা
জিউঁ গান্নেদী পোরী দা।

'তিরঞ্জন' কথাটার মুলে আছে বোধ করি স্ত্রী-রঞ্জন অর্থাৎ মেয়েদের চিত্ত-বিনোদন। দেখেশুনে মনে হল—এটা কোনো উৎসব নয়, পঞ্জাবি গ্রাম্য মেয়েদের ঘর-গৃহস্থালির একটি ছবি। কুমারী তরুণী, বিবাহিতা যুবতী, প্রৌঢ়া-বৃদ্ধা সকলকেই পাওয়া গেল এখানে। বেসিক ট্রেনিং কলেজের ছাত্রীদল মেক-আপ-এ ত্রুটি করেনি।

একে যদি উৎসব বলতে হয় তো বলা যায় স্নুতোকাটার উৎসব। মেয়েরা সারা রাত ধরে স্নুতো কাটে। রাত দশটা থেকে শুরু হয়, আর শেষ হয় যখন পুবের আকাশ ফর্সা হয়ে আসে, লতাপাতার আড়াল থেকে ভেসে আসে পাখি-পাখালির ডাক। কিন্তু সারা রাত ধরে এই কাজ চালিয়ে যাওয়া বড়ো সহজ নয়। ঘুম আসে, কাজে বিরক্তি লাগে। তাই পাঁচ সাত বাড়ির মেয়ে বউ জড়ো হয় একখানে, হাসি-ঠাট্টা মজাক-মস্করার মধ্যে কেটে যায় সময়টা। তাদের মুখে হাসি, হাতে কাজ। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মুখে ফেলে দেয় ভাজা মকাই, চিনেবাদাম, আখের টুকরো, ছোলা ও গুড়। যার বাড়িতে বসে স্নুতো কাটা হয়, তিনি খাওয়ান লসসি, শরবত ও চা। কিন্তু শিবহীন যজ্ঞ যেমন যজ্ঞই নয়, তেমনি গান ছাড়া কল্পনা করা যায় না পঞ্জাবি মেয়েদের মহফিল। মহফিলই বটে। অল্পবয়সী মেয়েদের কণ্ঠে গীত লেগেই আছে—ইশ্‌ক ও মোহব্বত, বিরহ-মিলনের গীত—

গুডডী অধ আসমান চঢ়াকে
ডোরা কট্টিয়াঁ মাহীনে।

হে প্রিয়, তুমি আমায় ভালোবাসায় বেঁধে চলে গেলে কোন দূর দেশে ? হায়, অর্ধ-আকাশ পথে ঘুড়ি উড়িয়ে তুমি সুতো দিয়েছ কেটে।

গানের ভাব যাই হোক না কেন, সুর চলে চরকার তালে। এই যন্ত্রযুগে গ্রামে বসেও পাওয়া যায় মিলের সস্তা কাপড়। তাই তিরঞ্জনের সে চেহারা আর নেই, তবু যতোদিন পঞ্জাবের মাটিতে কাপাস তুলো জন্মাবে, ততোদিন গ্রামে গ্রামে জমে উঠবে তিরঞ্জনের নৈশ মহফিল এবং পঞ্জাবিনীর হৃদয়-গহন থেকে বেরিয়ে আসবে গানের ফোয়ারা।

অনুষ্ঠানের শেষের দিকে একটি মেয়ে গাইল পঞ্জাবি লোকগীত। বড়ো ভালো লাগল। সব কথা মনে নেই, সবটার মানেও বুঝিনি। খানিকটা গেঁথে আছে মনে—

দিল দা টুকড়া ম্যাঁয় কাগজ বনাওয়াঁ
উঙ্গলীআঁ অটট কান্নী
অখখাঁ দা কজলা ম্যাঁয় শাহী বনাওয়াঁ
হনঝুআঁ দা পানীআঁ পানী।
আমি আঙুল কাটিয়া কলম করেছি
হৃদয়ে লিখিব বলি
চোখের কাজলে আঁখিজল ঢেলে
করেছি গো আমি কালি।

বিরহিনীর করুণ কান্না গায়িকার দরদি কণ্ঠে উদ্বেল হয়ে ওঠে। বিশাল জন-সমুদ্র বেদনায় বিহ্বল।

সম্মেলন থেকে ফেরার পথে মনের কোনে বার বার ঘুরে ফিরে আসছিল সেই অশ্রু-কোমল সুর মাধুরী—

চোখের কাজলে আঁখিজল ঢেলে
করেছি গো আমি কালি।

অখর্খাঁ দা কজলা ম্যাঁয় শাহী বনাওয়াঁ
হনঝুঁআঁ দা পানীআঁ পানী।

চলো বেরিয়ে পড়ি।

বেরিয়ে পড়ার মতো দিনটি বটে!

প্রথম দু-দিনের আবহাওয়া ছিল খুবই খারাপ, যৎপরোনাস্তি বিতিকিচ্ছি। সারাদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টিপ টিপ করে বৃষ্টি ঝরছে তো ঝরছেই।

তৃতীয় দিনে সূর্যের হাসি—সে হাসি যে কী মধুর! প্রিয়ার মুখের হাসির চেয়েও মিস্টি। এমন দিনে কি আর ঘরে থাকা যায়? মনের মধ্যে আনন্দের ঢেউ। পউসের প্রভাতসূর্য নীল আকাশে সোনালি কিরণ বিছিয়ে দিয়ে যেন অমৃতভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছে। আমার অন্তরাত্মা বলে উঠল—

চণ্ডীগড়ের পউস মাসের প্রভাতখানি
নে রে, ও মন, নে রে আপন প্রাণে টানি।

সত্যিই আজ বেরিয়ে পড়ার মতো একটি চমৎকার দিন।

কিন্তু আমি ছাদের উপর ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে আছি উত্তরের ঐ শিবালিক পাহাড়ের দিকে। বেলা প্রায় দুপুর। ঐ দূরে দেখা যায় কসৌলি—শিবালিক পর্বতের অন্যতম স্বাস্থ্যকর স্থান। ওখানে রৌদ্র ছায়ার কী সুমধুর খেলা! মেঘ ভেসে যায় কসৌলির উপর দিয়ে আর সেইসঙ্গে চলে তার ছায়া। যে আকারের যতোটুকু মেঘ ঠিক সেই আকারের ততোটুকু ছায়া। একই সঙ্গে ছায়া ও কায়ার এই অদ্ভুত লীলা-দর্শন এই আমার প্রথম। স্বয়ং মেঘও বুঝি নিচের

দিকে তাকিয়ে চলতে চলতে থমকে দাঁড়ায়। সাধ্বী রমণীর মতো অমনি দাঁড়িয়ে পড়ে কালো ছায়াখানি।

এক সময়ে বেরিয়ে পড়ি সদলবলে। পঞ্জাব সরকারের জনসংযোগ বিভাগের গাড়ি। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের হাতে।

প্রথমেই গেলুম—পিঞ্জোর গার্ডেন! পটিআলার প্রাক্তন মহারাজের ভূতপূর্ব বাগানবাড়ি। চণ্ডীগড়ের তেরো মাইল দূরে এই প্রমোদ উদ্যানটি তৈরি হয়েছিল মোগল আমলে। একদিন যে স্থান কেবল রাজা-মহারাজার চরণ-স্পর্শে ধন্য হয়ে উঠত, আজ সেখানে শত শত ইতরজনের আনাগোনা। যেখানে একদা গভীর নিশীথে শূরসুন্দরীদের নূপুর-নিক্কণ ছাড়া আর কিছুই শোনা যেত না, সেখানে আজ বহিরাগত নরনারীর অনিয়ন্ত্রিত কলোচ্ছ্বাস। জলের ফোয়ারাগুলি আজ বৃথাই জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। আমাদের মতো অরসিকের কৌতূহলী দৃষ্টি ছাড়া আর কে সেখানে জলকেলি করতে আসবে! অতীত দিনের সুখস্মৃতি নিয়ে পিঞ্জোর আজ যাদুঘরে পরিণত!

বেশ মনোরম জায়গাটি। পার্বত্য পঞ্জাবের ধূসরতার মধ্যে যেন একটি সবুজ স্বপ্ন। বন্ধুর পাহাড়ি জমিন কেটে কেটে তৈরি হয়েছে চারিটি ক্রমাবরোহী সমতলভূমি—তৃণাস্তীর্ণ ছায়া ঢাকা শ্যামল বনভূমি।

আজ রবিবার। তাই এতো দর্শনার্থীর ভিড়। কোথাও সপরিবারে ডেরা পেতেছেন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, কোথাও ফুর-ফুর করে উড়ে বেড়াচ্ছে হালকা তরুণীর দল, আবার কোথাও বা ঘনপত্র বহুল লতাবৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়ায় স্বর্গরচনায় রত মর্ত্যের নরনারী। জায়গাটি সত্যিই মনোরম।

এখান থেকে কালকা মাত্র পাঁচ মাইল। দলের অনেকেরই

ইচ্ছা হল সেখানকার রেলওয়ে রেস্তোরাঁ থেকে চা পান করে মেজাজটা একটু চাঙ্গা করে আসে।

কালকা স্টেশনটি ভালোই লাগল। বেশ ঝকঝকে, তকতকে, কিন্তু বড়োই নির্জন! রিফ্রেসমেণ্ট রুম-এ ঢোকা অবধি বেরিয়ে আসা পর্যন্ত আধ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে এক সুদর্শন যুগলমূর্তি ছাড়া আর কেউ সে নির্জনতা ভঙ্গ করেনি।

কালকা থেকে শিমলা—কতোই বা দূর? বড়ো জোর কুড়ি মাইল। কিন্তু ঐ যে উঁচু পাহাড়ের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে এগিয়ে চলেছে রেলপথ, ও পথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০ মাইল। রেলগাড়িতে লাগে পাঁচ ঘণ্টা, বাস-এ মাত্র ঘণ্টাতিনেক। এতো কাছে এসেও শিমলা সুন্দরীকে দেখা হবে না ভেবে মনটা একটু ব্যথিয়ে উঠল। কিন্তু গরমের দিনে যিনি পরমলোভনীয়া, এই ভর ডিসেম্বরে তিনিই ভীমা ভয়ঙ্করী! সেই ভয়ঙ্কর সুন্দরের পরিচয় নিতে আর সাহস হল না। তাই তাড়াতাড়ি নেমে এলুম চণ্ডীগড়ে।

সেক্টর-কে-সেক্টর টহল দিয়ে বেড়ালুম। সরকারি গাড়ি, সরকারি পেট্রোল—কুছ পরোয়া নেঁহী। সন্ধ্যা হবো-হবো—এমন সময় দাঁড়াতে হল একটা জায়গায়। রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম। ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই মিশনের আশ্রম রয়েছে, ছিল না এই পঞ্জাবে। লাহোরের আশ্রমটি বন্ধ হয়ে যায় ১৯৪৭-এ। তারপরে এই নতুন প্রচেষ্টা। পঞ্জাব সরকার স্বল্প মূল্যে তিন একর জমি দিয়েছেন মিশনকে। সম্প্রতি এখানে ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে তৈরি হয়েছে একটি পাকা বাড়ি। পরিকল্পিত ভবন সম্পূর্ণ হতে নাকি ছ-লাখ টাকার প্রয়োজন।

আশ্রমের সেক্রেটারি স্বামী বেদানন্দজির সঙ্গে আলাপ হল। বাঙ্গালি স্বামীজি কেবল মিস্টি কথায় আমাদের বিদায় করেন নি,

মিস্টিমুখও করালেন। ধন্য আমরা ঠাকুরের প্রসাদ পেয়ে। স্বামীজি ছাড়া আশ্রমে দ্বিতীয় ব্যক্তি রয়েছেন ব্রহ্মচারী বিদ্যাপ্রসন্ন। সুদর্শন এই তরুণ ব্রহ্মচারীটি এসেছেন সুদূর কেরালা থেকে। বিদ্যাপ্রসন্নের মধুর ব্যবহারে আমরা প্রসন্ন হলাম।

ফেরার পথে আলাপ হল বর্মাজির সঙ্গে—রোশনলাল বর্মা, জনসংযোগ বিভাগের অধিকর্তা। প্রৌঢ়বয়সী নিরীহ মানুষটি। চেহারায় পঞ্জাবি শৌর্যের পরিচয় বড়ো একটা নেই। একটু বিস্মিত হলাম।

আমার বৃত্তির কথা শুনে বর্মাজি বললেন—আমিও এককালে অধ্যাপক ছিলুম।

হাসতে হাসতে বললাম—তাহলে এখন আপনি কোটের রঙটা বদলে নিয়েছেন (Turn coat) বলুন—প্রফেসারি ছেড়ে অফিসারির গদ্দি-নশিন হয়েছেন।

কথা প্রসঙ্গে বর্মাজি এক সময়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, আপনি প্রফেসার গাঙ্গুলিকে চেনেন—লাহোর সনাতন ধর্ম কলেজে ম্যাথামেটিকস-এর প্রফেসর গাঙ্গুলি ?

—ভালোভাবেই চিনি। এখন তিনি কলকাতায় আছেন। আমি তাঁর সহকর্মী। কিন্তু আপনি তাঁকে চিনলেন কী সূত্রে ?

—আমি সনাতন ধর্ম কলেজের ছাত্র ছিলুম।

—তাহলে গাঙ্গুলি আপনার অধ্যাপক ?

—মোর দ্যান দ্যাট।—বর্মাজির চোখেমুখে বেশ একটা শ্রদ্ধার ভাব পরিস্ফুট।—তিনি আমার গুরু, পিতৃতুল্য। আপনি কলকাতায় গিয়ে তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাবেন।

বাংলার বাইরে জনৈক উচ্চপদস্থ পঞ্জাবি কর্মচারী তাঁর সুদূর ছাত্রজীবনের বাঙ্গালি অধ্যাপককে এতোটা শ্রদ্ধা মিশ্রিত

আবেগের সঙ্গে স্মরণ করছেন দেখে বাঙ্গালি হিসেবে আমার খুবই আনন্দ হল।

বর্মাজিকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা যখন বাইরে এসে দাঁড়ালাম, তখন শীতের আকাশে অযুত নক্ষত্রের মেলা।

সকাল সাতটা। সবেমাত্র ভোর হয়েছে। এখনো সূর্যোদয় হয়নি। আজ আমরা তীর্থযাত্রী—চলেছি পঞ্জাবের শ্রেষ্ঠ তীর্থ ভাক্রা-নাঙ্গল।

ভাবতে ভাবতে চলেছি, দেখতে দেখতে চলেছি। পঞ্জাবের এ অঞ্চলটি বেশ উর্বর ও মনোহর। দু-ধারে আখ ও গেহুঁর সবুজ সমারোহ, ফাঁকে ফাঁকে সর্শে ক্ষেতের সোনালি স্বপ্ন। মাঝে মাঝে নদী—কোনোটা শুকনো, কোনোটা সজল। উত্তরে বহুদূরে হিমালয়ের উন্নত শৈলমালা।

গাড়ি চলেছে পূর্ণবেগে—কখনো উত্তরে, কখনো পশ্চিমে, কখনো বা উত্তর-পশ্চিমে। পথের ধারে সারি সারি গাছ, সেই গাছের ফাঁকে ফাঁকে প্রভাত সূর্যের লুকোচুরি।

দেহাতি পঞ্জাব। এখানকার আকাশে বাতাসে, বনে প্রান্তরে মিশে আছে যে পল্লিবালার সকরুণ কান্না, তারই কথা মনে পড়ছে বার বার। একালের নয়, সেকালের মেয়ে। আজ থেকে চারশো বছর আগেকার কাহিনি—হীর-রাঁঝার প্রণয়-গাথা। হীর ভালোবেসেছিল রাঁঝাকে। দুজনেই মুসলমান, তবু তাদের মিলনে বাধা এল—সামাজিক বাধা। উচ্চ সিয়ালবংশের মেয়ে, কুলীনের মেয়ে হীর। আর রাঁঝা বংশে জাট। কেবল কি তাই? মোষ চরিয়ে দিন চালাতে হয় তাকে। জন্মে জাট,

পেশায়, মহীওয়াল, তার হাতে কি কখনো মেয়ে দিতে পারে সিয়ালবংশের চৌধুরি চূচক শাহ? কলঙ্কের ভয়ে উপযুক্ত বরের সন্ধান চলতে থাকে। জানতে পেরে হীর বেঁকে বসে: ম্যাঁয় তন মন রাঁঝেদা জেডা সাডে ঘরদা মাহী। হোক না রাঁঝা মহীওয়াল, আমি মনে প্রাণে তাকেই নিয়েছি বরণ করে।—পঞ্জাবিন বালার উপযুক্ত কথাই বটে!

কিন্তু রাঁঝা নিজেই একদিন চলে গেল সে দেশ ছেড়ে—তারই জন্যে তো হীরের এই বিড়ম্বনা। ইতিমধ্যে ঢোলক বেজে ওঠে চূচক শাহের আঙ্গিনায়, আসে কাজি, আসে পড়োশি ভাই-বেরাদর। অনিচ্ছাসত্ত্বেও হীরকে সাজতে হয় দুলহন। বিয়ে হল বটে, কিন্তু হীর ভুলতে পারেনি রাঁঝাকে। সখির কাছে প্রকাশ পায় তার মনোব্যথা: রাঁঝা মেরা ফুলগুলাবী, ম্যাঁয় হুন উস দে জলদী মুরগাবী।—বেশ দীর্ঘ কাহিনি, হীরের মর্মন্তুদ আত্মাহুতিতে কাব্যের সমাপ্তি।

ঝঙ্গ স্টেশন থেকে আধ মাইল দূরে চনাব নদীর তীরে আজও রয়েছে হীরের ছোট্ট সমাধি—মকবরা-ঈ-হীর।

আরবিতে লায়লা-মজনুঁ, ফারসিতে শীরীঁ-ফরহাদ, পঞ্জাবিতে তেমনি হীর-রাঁঝা। হিন্দু-শিখ-মুসলমান—পঞ্জাবের সমগ্র নরনারীর অতি আদরের বস্তু কবি ওয়ারিস শাহের এই রোম্যান্টিক প্রণয়-কাব্য 'হীর'।

মধ্যযুগের মুসলমান কবি ওয়ারেস শাহ আর আধুনিক যুগের শিখ মহিলা কবি অমৃতা প্রীতম। ১৯৪৭-এ যখন শতশত অসহায় নারীর আর্তকণ্ঠে পঞ্জাবের আকাশ ভরে ওঠে, সেই ভয়ঙ্কর দুর্দিনে অমৃতা প্রীতম লিখলেন ওয়ারেস শাহের স্মরণে—

হে কবি, আজও কি তুমি ঘুমিয়ে থাকবে কবরের অন্ধকারে? একবার খোল তোমার মুখ, তোমার অমর প্রেমগাথার সঙ্গে

জুড়ে দাও আর একটি অধ্যায়।

একদিন কেঁদেছিল পঞ্জাবের একটি মেয়ে; তোমার কণ্ঠে চিরন্তন হয়ে রইল তার ব্যথিত কান্না। আজ কি তুমি দেখছ না কতো শত মেয়ে কেঁদে বেড়ায় পঞ্জাবের পথে পথে? আজ প্রান্তর ভরে গেল মানুষের মৃতদেহে, চনাব নদীর বুকে বইছে রক্তের ধারা।

অজ্জ আখাঁ ওয়ারিস শাহ নূঁ কিত্তোঁ কব্‌রাঁ বিচোঁ বোল্‌
তে অজ্জ কিতাবে-ইশক দা কোঈ অগলা ওয়রকা ফোল।
ইক রোঈ সী ধী পঞ্জাব দী তূঁ লিখ লিখ মারে বৈন
অজ্জ লকখাঁ ধীআঁ রোন্দীআঁ ত্যায় নূঁ ওরারিশ শাহ নূঁ
কহিন্‌......

হে কবি, একবার তুমি সাড়া দাও তোমার কবর থেকে, তোমার অমর প্রেম-গাথার সঙ্গে জুড়ে দাও আর একটি অধ্যায়।

গাড়ির মধ্য থেকে দেহাতি পঞ্জাবের শান্ত শ্রীর দিকে তাকিয়ে আমার মন চলে গেছে সুদূর অতীতে—বিংশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মায়ালোকে। চনাব নদীর কুল কুল ধ্বনির মধ্যে এখনও বোধ করি শোনা যায় সেই বিরহিণীর ব্যাকুল কণ্ঠ—

ম্যাঁয় তন মন রাঁঝেদা—জেডা সাড়ে ঘর দা মাহী।

গাড়ি এসে দাঁড়াল রোপড়—চণ্ডীগড় থেকে পঁচিশ মাইল। রোপড়ের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে সরহনদ ক্যানেল। অদূরেই শতদ্রু নদীর ধারা।

চণ্ডীগড় থেকে এ পর্যন্ত প্রায় সমতল। রোপড় ছাড়িয়ে শুরু হল পাহাড়ি এলাকা। সে পাহাড় মানে মাটির ঢিপি,

যেমন দেখা যায় আসানসোল ছাড়িয়ে বাংলা-বিহারের সীমানায়। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই মাটিই রূপ নিয়েছে কঠিন কালো পাথরের —৪০ মাইল দূরে ভাক্রা রীতিমত পার্বত্য অঞ্চল।

পথটি বড়োই সুন্দর। পাশাপাশি রেল লাইন—কোথাও বামে, কোথাও দক্ষিণে, কোথাও আবার হারিয়ে যায় পাহাড়ের আড়ালে। এ তো বেশ লুকোচুরি খেলা! হঠাৎ দেখি একটা জায়গায় রেলপথ ও বাস-রুট-এর সমান্তরাল চলেছে সুদীর্ঘ ক্যানেল—পাহাড়ি পঞ্জাবের প্রাণধারা। মানুষ একদিন এই সমস্ত সৃষ্টি করেছিল প্রয়োজনের তাগিদে, আজ সেই প্রয়োজনের মধ্যে ফুটে উঠেছে ছন্দের সৌন্দর্য।

সামনে ঐ বিরাট নদী। ফুলে ফুলে উঠছে পার্বত্য জলরাশির প্রচণ্ড আবর্ত। আমরা অনায়াসে পেরিয়ে এলাম তাকে। আর কী আশ্চর্য, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে এল ক্যানেলের ধীর শান্ত প্রবাহ। নিচে পাহাড়ি নদী বৃথাই মাথা কুটে মরছে পাথরের গায়ে।

বেলা প্রায় সাড়ে নটা। রাস্তার লোক চলাচল ও পথিপার্শ্বের লোকালয় দেখে মনে হল কোনো বিশিষ্ট জনপদের কাছাকাছি এসে পড়েছি আমরা। কিন্তু এখানে কোন শহর? শহর নয়, গ্রাম—প্রাচীন সমৃদ্ধ গ্রাম আনন্দপুর। শিখরা বলেন—আনন্দপুর সাহেব। আহা, বলবেনা? এই আনন্দপুরেই যে ওদের নবজন্ম।

১৫৩৯। গুরু নানক দেহরক্ষা করলেন। একে একে এলেন শান্তিপ্রিয় ধর্মগুরু অঙ্গদ, অমরদাস, রামদাস ও অর্জুন। ১৬০৬ সালে জাহাঙ্গিরের হাতে অর্জুনের নিধন শিখদের জাতীয় জীবনে প্রথম মর্মান্তিক আঘাত। কিন্তু নবম গুরু তেগবাহাদুর পর্যন্ত শিখসম্প্রদায় ছিল বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ও দুর্বল। মুঘলদের

হাতে মার খেয়েই এসেছে এতোদিন, দিতে পারেনি। শিখদের পবিত্রারূপে আবির্ভূত হলেন দশমগুরু গোবিন্দ সিংহ। এই আনন্দপুর ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র।

—ইহাঁ কিতনী দের তক গাড়ী ঠহরেগী জী ?

—পন্দ্রহ মিনট !

আশ্বস্ত হয়ে গাড়ি থেকে নামলুম। সামনে ঐ চমৎকার গুরুদোয়ারা। কেবল বিরাট নয়, ঐতিহ্যমণ্ডিত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ। গোবিন্দ তখন ন-বছরের বালকমাত্র। কিন্তু সেই বয়সেই তাঁর কথায় ও আচরণে প্রকাশ পেল ভবিষ্যত জীবনের আভাস। পাবে না ? হোন হার বিরওয়ানকে হোত চীকনে পাত। সেবার কাশ্মিরি ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা এসে তেগবাহাদুরের কাছে নিবেদন জানালেন—'বাদশাহি জুলুমের ভয়ে দলে দলে হিন্দু মুসলমান হয়ে যাচ্ছে। আপনি আমাদের রক্ষা করুন।'

গুরুজি বললেন—'কেবল অর্জুনের আত্মাহুতিই যথেষ্ট হয়নি। অত্যাচারীর চৈতন্যোদয়ের জন্য আরও বলিদান চাই।'

ন-বছরের বালক গোবিন্দ বলে উঠল—'পিতাজি, এক্ষেত্রে আপনার চেয়ে যোগ্যতর আর কে আছে ?'

পুত্রগৌরবে উৎফুল্ল গুরুজি চলে গেলেন দিল্লি-দরবারে। আর ফিরে এলেন না।

যখন তাঁর শিরশ্ছেদের সংবাদ এসে পৌঁছুল আনন্দপুরে, দুর্জয় প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠলেন গোবিন্দ রায়। গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি ঘোষণা করলেন—'আর পীর নয়, মীর ; সন্ত নয় সৈনিক ; গুরু নয়, যোদ্ধা।' সেদিন শিখজাতির জীবনে দেখা দিল নতুন প্রভাত।

গুরুদোয়ারার দিকে তাকিয়ে আছি—যেন ইতিহাসের পৃষ্ঠা উন্মোচিত হল আমার সামনে।

১৬৯৯। চৈত্রের শেষ দিন। গুরু গোবিন্দের আহ্বানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার শিখ এসে জমায়েত হল আনন্দপুরের উন্মুক্ত প্রান্তরে। সামনে একটি পর্দা-ঝোলানো তাঁবু। কিন্তু গুরুজি কোথায়? সকাল বেলার ভজন-কীর্তনও শেষ হয়ে গেল, কিন্তু কোথায় গুরুজি? জনতার চোখে মুখে অধীর আগ্রহ। অকস্মাৎ পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন গুরুজি—চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখে নৃশংস কঠোরতা, হস্তে শাণিত তলোয়ার। তীক্ষ্ণ অস্ত্র উঁচিয়ে বজ্রকণ্ঠে গুরুজি প্রশ্ন করলেন: 'এমন কে আছে, হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্যে যে আমার এই তলোয়ারের মুখে শির নোয়াতে প্রস্তুত?' অপ্রত্যাশিত গুরুজির প্রশ্ন। সভা নিস্তব্ধ, ভীত-সন্ত্রস্ত। সেই হাজার হাজার লোকের মধ্যে উঠে দাঁড়ালেন একমাত্র দয়ারাম—লাহোরের ক্ষত্রী দয়ারাম। গুরুজি তাঁকে টেনে নিয়ে গেলেন তাঁবুর অভ্যন্তরে, তারপরে রক্তমাখা তলোয়ার হাতে আবার এসে জানালেন সেই আহ্বান। গুরুজির কঠিন আহ্বানে একে একে সাড়া দিল জাট ধর্মদাস, রজক মোখমচাঁদ, নাপিত সাহিবচাঁদ, পাচক হিম্মত রায়।

জনতা রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করছে পরবর্তী ঘটনার জন্যে। এমন সময়ে গুরুর আদেশে পর্দা সরে যেতেই দেখা গেল—মঞ্চের উপর দণ্ডায়মান রণসজ্জা পরিহিত গৌরবদীপ্ত নির্ভীক পঞ্চবীর। জাতিবর্ণের ভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে গুরু এই নবগঠিত খালসাদলের উপাধি দিলেন 'সিংহ'। দয়াসিং, ধর্মসিং, সাহিবসিং ও হিম্মত সিং। আর স্বয়ং গোবিন্দ রায় হলেন গুরু গোবিন্দ সিং। সেদিন আনন্দপুরের আকাশ বিদীর্ণ হল পঞ্চাশ সহস্র কণ্ঠের বজ্র নির্ঘোষে:

ওয়াহ গুরুজি কা খালসা
ওয়াহ গুরুজি কী ফতেহ।

গোবিন্দ সিং উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানালেন শিখজাতির উদ্দেশ্যে—

তোমরা সকলে এস মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ!

রাম ও লক্ষ্মণ রামলক্ষ্মণ। দ্বন্দ্ব সমাসের একই নিয়মে ভাক্রা ও নাঙ্গাল ভাক্রানাঙ্গাল। পঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশের সীমান্তে শতদ্রু-ধৌত অঞ্চলের দুটি জায়গা। সাত-আট মাইলের ব্যবধান মাত্র। নাঙ্গাল যাহোক কিছুটা সমতল—ভাক্রা পুরোপুরি পার্বত্য এলাকা।

নাঙ্গাল-এ এসে পৌঁছলুম বেলা সওয়া দশটায়। শহরের আগে যেমন শহরতলি ভাক্রার আগে তেমনি নাঙ্গাল। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ময়দানবের বিরাট কর্মশালা। বাইরের আনাড়ি লোক যে হকচকিয়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কী? নেহরুজি ঠিকই বলেছেন—Its construction is something tremendous, something stupendous and something which shakes you up when you see it.

এই সেই শতদ্রু। স্থানীয় লোকেরা বলে সতলুজ, যার থেকে ইংরেজি নাম হয়েছে সাটলেজ।

সতলুজ চলে বয়ে। শেষ ডিসেম্বরের সতলুজ। কেমন শান্ত বিশীর্ণ চেহারা! কে বলে যে প্রথম গ্রীষ্মে হিমালয়ের বরফগলা জলরাশি নিয়ে এই শান্ত নদীটিই ভীম ভয়ঙ্কর রূপে

ভৈরব হুঙ্কারে এগিয়ে চলে পঞ্জাবের বুকের উপর দিয়ে? সতলুজ কখনো কুলবধূ, কখনো কূলনাশিনী, কখনো ভৈরবী, কখনো গৃহিনী।

সতলুজ চলে বয়ে। মানস সরোবর থেকে উদ্ভূত সতলুজ তিব্বত পেরিয়ে হিমাচল প্রদেশের অরণ্য পর্বত ও জনপদের মধ্য দিয়ে বিচিত্র নৃত্য-ভঙ্গিমায় চলতে চলতে অকস্মাৎ বাধা পেল এসে পঞ্জাব-সীমান্তে। স্বৈরিণী হল বন্দিনী। সতলুজ এতো জল বয়ে নিয়ে যায় সিন্ধুনদের বুকে, অথচ পূর্ব পঞ্জাবের দক্ষিণাংশ ঊষর মরুভূমি। মানুষের বিজ্ঞানী ও বিষয়-বুদ্ধি সজাগ হয়ে উঠল। হায় সতলুজ কি জানে, তার স্বচ্ছন্দ গতিপথে এই বন্ধন-সৃষ্টির আয়োজনই বহির্বিশ্বে গালভরা নাম পেয়েছে—ভাক্রা-নাঙ্গাল প্রজেক্ট!

ভাক্রা-দাম দেখতে হলে অনুমতিপত্রের প্রয়োজন। নাঙ্গাল থেকে রিকশায় চেপে যখন আমরা দুই বন্ধু গিয়ে পারমিট-অফিস-এ পৌঁছলুম, তখন সেখানকার মনোরম উদ্যানে রৌদ্র-স্নানের মহোৎসব। আমার কী মনে হল জানেন? গান দিয়েই বলি তাহলে—

সকল আকাশ সকল ধরা
আনন্দে হাসিতে ভরা
যেদিক পানে নয়ন মেলি
ভালো সবই ভালো।

অফিসের কর্মচারিদের মনেও বোধকরি লেগেছে সুরের পরশ। ঘর ছেড়ে তাঁরা বাইরে এসে বসেছেন চেয়ার পেতে। সংবাদ আমরা আগেই পাঠিয়েছিলুম। তাই যেতেই সাদর অভ্যর্থনা: আইয়ে বৈঠিয়ে। আপনারা তো কলকাতা থেকে এসেছেন?

বলা বাহুল্য, পারমিট পেতে কোনো অসুবিধাই হয়নি। আমাদের দলের সাতজনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল মিস্টার সুয়ার্জকে। চণ্ডীগড় থেকে আমরা একই গাড়িতে এসেছি। তখন কে জানত ভদ্রলোক আমাদেরই মতো সৌখিন ভিজিটার! আলাপ হল এখানে এসে। চেহারা দেখেই অনুমান করেছিলুম লোকটা জর্মান। নাম শুনে আর সন্দেহ রইল না। পরে জানলুম—এদের পরিবার কয়েক পুরুষ ধরে আমেরিকার অধিবাসী। বর্তমানে এরা ইংরেজি-ভাষাভাষী। মাতৃভাষার সঙ্গে আর সম্পর্ক নেই। সুয়ার্জের বয়স অল্পই, সবেমাত্র ছাত্র-জীবন শেষ করে বেরিয়েছে দেশ ভ্রমণে।

মুশকিল হল ফেরার সময়ে। সুয়ার্জ এসেছিল পায়ে হেঁটে। আর আমরা রিকশা নিয়ে এসেছি একখানা। ধারে কাছে আর দ্বিতীয় রিকশা নেই। অবশ্য সুয়ার্জ যদি পদব্রজেও যায়, তবু তার দীর্ঘ পদক্ষেপ যে আমাদের রিকশাকেও পিছনে ফেলে যাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। চেহারাটা যেমনি চওড়া, তেমনি লম্বা। কিন্তু বিদেশী ভদ্রলোক, আলাপ পরিচয় হয়েছে, তদুপরি একই পারমিটের যাত্রী। তাকে ফেলেই বা যাই কী করে?

পন্থা বাতলে দিল রিকশাওয়ালা। আমরা লিকলিকে দুটি বাঙ্গালি বসেছি যথাস্থানে, আর সুয়ার্জ বসল রিকশাচালকের আসনে—আমাদের দিকে মুখ করে। ঢালু পথ। রিকশাওয়ালা প্যাডেলের উপর উঠে দাঁড়াতেই গাড়ি সচল হল। আমি, বন্ধু এবং সুয়ার্জ—এই trinityর সে এক অপূর্ব দৃশ্য। আশেপাশের আবালবৃদ্ধবনিতা সবিস্ময়ে অবলোকন করছে পৃথিবীর এই অষ্টম আশ্চর্য। কলকাতা হলে বোধকরি হৈ হৈ করে ছুটে আসত পথচারির দল।

নাঙ্গাল থেকে ভাক্রা যাওয়ার দুটি উপায়—বাস অথবা লাইট

রেলওয়ে। ট্রেন ছাড়ার আর দেরি নেই, সুতরাং স্টেশনেই আসা গেল। এই আট মাইল দীর্ঘ রেলপথের ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রধানত শ্রমিকদের যাতায়াতের জন্য। কেবল একখানি কামরায় লেখা আছে For visitors only। পথের মাঝে মাঝে গাড়ি থামে আর হুড়মুড় করে উঠে পড়ে শ্রমিক দল।

গাড়ি চলছে, আর আমরাও দুচোখ ভরে দেখতে দেখতে চলেছি—ভগবানের দান নয়, মানুষের কীর্তি। ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে চারিদিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে নিচ্ছি। এতো পয়সা খরচ করে এলুম, আবার কবে আসা হবে কে জানে? সুতরাং কিছুই যেন বাদ না যায়। কিন্তু সুয়ার্জ এমন নির্বিকার কেন? নাড়ুর গন্ধে বালখিল্যেরা চঞ্চল হয়ে উঠলেও প্রবীণেরা যেমন নির্বিকার থাকে, অনেকটা তেমনি। থাকবে না? এসেছে কোন দেশ থেকে? 'মেরিকা!

অকস্মাৎ সমস্ত কামরা অন্ধকার হয়ে গেল—কী ব্যাপার? ওঃ, টানেল। আধ ঘণ্টা পরে ট্রেন এসে দাঁড়াল একটা জায়গায়। এবারে বাকি অংশটুকু যেতে হবে বাস-এ। 'দাম' পর্যন্ত যাতায়াতের ভাড়া চার আনা। একবার ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়েই হৃৎকম্প উপস্থিত হল। একদিকে সোজা উঠে গেছে খাড়া পাহাড়, আর একদিকে গভীর খাদ—বহু নিচে শতদ্রুর ধারা।

টিকেটের উপর লেখা রয়েছে—'ভ্রমণকারী সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে চলাফেরা করছেন, বিপদ-আপদ বা মৃত্যুর জন্যে সরকার দায়ি নয়, কিন্তু মৃত্যুর ফাঁদ যে পাতা রয়েছে চারিদিকে।

বাস থেকে নেমেই পেলাম গাইড। ভদ্রলোক একদলকে বিদায় দিয়েছেন মাত্র, এবারে পড়লেন আমাদের নিয়ে—Bhakra Nangal Project is one of the biggest River Valley Projects not only in India······হাত নেড়ে নেড়ে

অনর্গল তথ্য পরিবেশন করে চলেছেন ভদ্রলোক। সব কথা মনে রাখা দূরে থাক, বুঝে ওঠাই দায়।

ঐ যে 'দাম' দেখছেন—এখনও শেষ হয়নি তৈরি—'৫৯ সালের মাঝামাঝি শেষ হবে বলে আশা করা যায়। '৫৫ সালের ১৭ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী নেহেরু ঢেলে দিলেন এক বালতি কংক্রিট—শুরু হল 'দাম'-এর কাজ। দাম মানে কংক্রিটের এক বিরাট পর্বত—৭৬০ ফুট যার উচ্চতা। দিল্লির কুতুব মিনার নিশ্চয়ই দেখেছেন আপনারা—পর পর তিনটি মিনার কল্পনা করুন। এতো উঁচু দাম পৃথিবীর আর কোথাও তৈরি হয়নি—না আমেরিকায়, না সোভিয়েটের দেশে।

বাঁধের ভিত গাঁথা শুরু হয়েছে নদীগর্ভের ২৬০ ফুট নিচে থেকে—কতো পাহাড় খুঁড়তে হয়েছে একবার ভেবে দেখুন। ইংরেজি 'ভি' অক্ষরের মতো গড়ে-ওঠা এই বাঁধের দৈর্ঘ্য নিচে ৩০০, উপরে ১৭০০ ফুট; প্রস্থ নিচে ১৩১০, উপরে ৩০ ফুট। এই বিশাল বাঁধ নির্মাণে যে কংক্রিটের প্রয়োজন হচ্ছে তার মূল্য ১৮ লক্ষ নয়, ১৮ কোটি টাকা। কংক্রিটের পরিমাণ? প্রতি ঘণ্টায় চারশো টন হিসেবে ঢালতে থাকুন, দিবারাত্র ২৪ ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্ন কাজ করেও সাড়ে তিন বছরের আগে শেষ হবে না। পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য মিশরের পিরামিড—নাম সকলেই শুনেছেন, কেউ বা দেখেও থাকবেন। সমস্ত পিরামিড নির্মাণে যতোটা মালমশলার প্রয়োজন হয়েছে, তার তিনগুণ মশলা নিয়ে গঠিত হচ্ছে ভারতের এই গৌরব—স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ কীর্তি—ভাক্রা দাম।

ভদ্রলোক একবার ঢোক গিললেন মাত্র। তারপরেই আবার শুরু হল—

এই বাঁধের কঠিন বন্ধনে সতলুজ থাকবে চিরবন্দি হয়ে এবং

তার জলরাশি ধরে রাখবার জন্য বিভিন্ন পাহাড় যুক্ত করে তৈরি হচ্ছে এক বিরাট সাগর—গুরুগোবিন্দের পুণ্য নামে উৎসর্গিত গোবিন্দ সাগর। ৬৪ বর্গমাইল পরিমিত এই সাগরে যে জল সঞ্চিত হবে তার পরিমাণ দাঁড়াবে ৭৪ লক্ষ একর ফুট।

দাম তৈরি হচ্ছে সতলুজের বুকে, কিন্তু এই কাজে হাত দেওয়ার পূর্বে যে সকল প্রাথমিক কাজ করতে হয়েছে তার পরিমাণও কম বিস্ময়কর নয়। রেল-লাইন, অফিস, কল-কারখানা, বাড়িঘর প্রভৃতি তৈরির জন্য এই পার্বত্য এলাকার উপরে চালাতে হয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার চূড়ান্ত পরীক্ষা। তিনশো ইঞ্জিনিয়ার এবং আট হাজার শ্রমিক নিয়ে কাজ শুরু হয়। তারপরে বিরাট কর্মব্যস্ততার সময়ে এই সংখ্যা উঠেছিল দেড় লাখেরও উপরে।

বাই-দ্য-বাই, বাঁধের ভিত-পত্তনের কালে সতলুজের জলগুলো গেল কোথায়? কোথায় আর যাবে? মানুষের বিজ্ঞানী বুদ্ধি নদীর দুদিক থেকে বের করে দিল দুটি টানেল—৫০ ফুট ব্যাসের আধ মাইল লম্বা পৃথিবীর বৃহত্তম দুটি টানেল। সাড়ে তিন কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই টানেলের অন্ধকার পথ ধরে ধাবিত হয় পাহাড়ি নদীর চঞ্চল জলধারা। আধ মাইল পরে বাঁধের সীমা পেরিয়ে নদী আবার ফিরে আসে তার নিজস্ব গতিপথে। And quiet flows the Sutlej······সতলুজ চলে বয়ে·········

জোবতি ক্যান বা কর মন ভারি!
ঢাহা থনে আইন্যা দিমু ট্যাহাদামের মটোরি।

পূর্ববঙ্গের জলপথে নয়, পূর্ব পঞ্জাবের স্থলপথে। দেহাতি মাঝিমাল্লার সরল মধুর কণ্ঠে নয়, শহুরে অধ্যাপকের কাংস্যকর্কশ গলায়। কিন্তু ভাগ্যিস, দ্রুত ধাবমান গাড়ির রোষ-গর্জনকে ছাপিয়ে এ অপূর্ব সংগীত কারো শ্রুতিগোচর হচ্ছে না।

দেশবিভাগের পরে দেশের ভাষাও প্রায় ভুলতে বসেছি। কলকাতার কৃত্রিম পরিবেশে প্রাণের কথা বলার সুযোগ কই? তাই আজ বাংলাদেশ থেকে বহুদূরে পথচলার এই মানসিক নির্জনতায় অন্তরে জেগে উঠল প্রাণের আদিম উল্লাস। হু-হু করে এগিয়ে চলেছি—আমার চোখের সামনে প্রকৃতির রঙ্গভূমি পঞ্জাবের বিচিত্র প্যানোরমা। কিন্তু আমার মানসপটে উদ্ভাসিত অন্যরূপ: চৈত্রের আকাশতলে জ্যোৎস্না-মাখানো ঘুমন্ত নদী, দুই তীরে ঘনবনের আড়ালে-আবডালে সুখসুপ্ত পল্লিগ্রাম, জলের ওপর ডিঙ্গিচলার ছলাৎছল ধ্বনি, আর ছই-এর ভেতর শুয়ে শুয়ে সেই অব্যক্ত ধ্বনি-মাধুর্যের আস্বাদন! আহা, তেমন দিন কি আর আসবে জীবনে?

ভাক্রা-নাঙ্গল থেকে ফিরতি পথের যাত্রী আমরা। আমার পাশেই বসেছেন এক সর্দারজি। কী তাগড়াই চেহারা, কী শ্মশ্রুরাজির বাহার আর গুম্ফের কী ছটা! কোথায় লাগে কলকাতার শিখ? বাংলাদেশের জলবায়ু ওদের যেন মিইয়ে দিয়েছে। আমি এক একবার তাকাই সর্দারজির দিকে আর মনে মনে ভাবি আমাদের শারীরিক দৈন্যের কথা।

কিন্তু পরক্ষণেই মনকে বোঝাই—কিসের দৈন্য? পঞ্জাব ভারতকে দেবে সৈনিক, বাংলা দেবে সাহিত্যিক; প্রতিটি পঞ্জাবি যোদ্ধা তো প্রতিটি বাঙ্গালি বোদ্ধা। ওরা চালাবে তলোয়ার, আমরা চালাব কলম। আর একথা কে না জানে—পেন ইজ মাইট্যার দ্যান সোর্ড?

সর্দারজি বলছিলেন—বংগালি ভারি ভিরু, ডরপোক; লড়াই-ভিড়াই কুছু জানে না, জানে সির্ফ কলম-নবিশি।

আমি বললুম—সর্দারজি, যদি ইজাজৎ দেন তো একটা শের শোনাই :

খীঁচো ন কমানোঁকো ন তলওয়ার নিকালো,

জব তোপ মুকাবিল হো তো অখ্‌বার নিকালো।

খুব একটা আত্মতৃপ্তির ভাব নিয়ে সটান হয়ে বসলুম। এরপরে আর আলাপ জমতে দেরি হল না।

—কিথে জান্দা সর্দারজি ?

সর্দারজির সে কী আকর্ণবিস্তৃত হাসি! মনে মনে একবার সিংহের হাসি কল্পনা করুন। সর্দারজির হাসির তাৎপর্য বোধ করি এই—দেখিয়ে, বংগালি বাবু সাডে পঞ্জাবি জুবান ভী বুলছে।

কট্টর অকালি এই সর্দারজি—মাস্টার তারাসিং-এর উগ্র চেলা। 'পঞ্জাবি সুবা'র প্রসঙ্গ তুলতেই সেই যে তিনি ঘড়র ঘড়র করে বকতে থাকলেন তার আর বিরাম নেই। কখনো হিন্দি, কখনো পঞ্জাবি, কখনো উর্দু, কখনো বা ইংরেজি। আমি এক কথা বলি তো উনি দশ কথায় উত্তর দেন।

—তুমি সালা কংগ্রেস বলেছিলে আজাদি মিলবে তো জুবানকে মোতাবিক সুবা বানিয়ে দেবে। আজাদি মিলল তো পুরানা ওয়াদা বেমালুম ভুলে গেল। ফির মোরচা বানাও, তায়দাদ বঢ়াও, খুন নিকালো—তব তো। অরে বাবা, সারে হিন্দুস্তানমেঁ জুবানকে মোতাবিক সুবা তৈরি হল, বাদে বম্বে ও পঞ্জাব। আচ্ছা, হম ভী দেখ লেঙ্গে।

আমরা বাঙ্গালি ভাষার ভিত্তিতে চেয়েছিলাম Greater Bengal—বৃহত্তর বঙ্গ। এঁরা চান ক্ষুদ্রতর পঞ্জাব। আমাদের দাবি ছিল : ভিন্ন প্রদেশের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল এনে বাংলার

সঙ্গে যুক্ত কর। এদের দাবি হচ্ছে: পঞ্জাব থেকে হিন্দিভাষী এলাকা ছেঁটে দিয়ে কেবল পঞ্জাবি পঞ্জাব গড়ে তোল! সমগ্র পঞ্জাবের ভাষা তো আর পঞ্জাবি নয়। পূর্ব পঞ্জাবের পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চল অর্থাৎ কর্নাল, হিসসার, রোহতক, গুরগাঁও, আম্বালা—এক কথায় গোটা আম্বালা ডিভিশন-এর ভাষা পশ্চিমা হিন্দি। এগুলো নিয়ে হরিয়ানা প্রান্ত্ করতে চাও কর, উত্তর প্রদেশের সঙ্গে জুড়ে দিতে চাও, দাও। কিন্তু হিন্দি পঞ্জাবি মিলিয়ে একটা দ্বিভাষিক রাজ্য?—সে আমরা চাইনে।

কেন চাইনে শুনবেন? সোজা উত্তর—হিন্দি আমাদের মাতৃভাষা ভুলিয়ে তবে ছাড়বে। বহুভাষী এই ভারতবর্ষে হিন্দির একটা স্বাভাবিক সুযোগ রয়েছে নিজেকে ছড়িয়ে দেবার, যার ফলে অহিন্দিভাষী প্রদেশগুলো একে একে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছে হিন্দির সামনে। তাই দেখুন নিজস্ব ভাষা থাকা সত্ত্বেও বিহার ও রাজস্থানের সরকারি ও সাহিত্যিক ভাষা হিন্দি। বাংলা ও পঞ্জাবের মাথা নোয়াতে পারলে হিন্দি ভাষার আর্যাবর্ত-বিজয় সম্পূর্ণ হত। কিন্তু বাদ সাধলেন পন্থরতন মাস্টার তারা সিং—ইংরেজ আমলে করেছি উর্দুর গোলামি, আজাদ হিন্দুস্তানে করতে হবে হিন্দির গোলামি? হর্গিজ নহী।……

হিন্দি রক্ষা সমিতির পাণ্ডারা কী বলে জানেন? বলে কিনা আমাদের মাতৃভাষা পঞ্জাবি নয়, পঞ্জাবি কোনো ভাষাই নয়, একটা আঞ্চলিক বোলি—রিজিওনল ডায়লেক্ট্ মাত্র। শুনুন কথা। কবুল করছি আমাদের উঁচুদরের সাহিত্য নেই। মায়ের কোল থেকে অসি চালনায় অভ্যস্ত আমরা; মসীলিপ্ত হব কখন? তাই বলে কি আমাদের মাতৃভাষা জহান্নুম-এ যাবে? ফিল-হাল আমরা পেয়েছি ভাই বীর সিং এবং অমৃতা প্রীতম-এর মতো কবি। উপন্যাসে প্রথম শ্রেণীর না হলেও ভালো লেখক জন্মেছেন

কয়েকজন—নানকসিং, গুরবখস সিং, নরিন্দর পাল, জসবত সিং। ছোটো গল্পে কুলবন্ত সিং, কর্তার সিং দুগ্‌গল……

আমি বাধা দিয়ে বললুম—আচ্ছা সর্দারজি, পূর্ব পঞ্জাবে হিন্দির সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জাবিকেও তো সরকারি ভাষারূপে মঞ্জুরি দিয়েছে।

—বেশক। কিন্তু এতেই পঞ্জাবির ভবিষ্যত নিরাপদ নয়। একবার ভেবে দেখুন তো হিন্দি ও বাংলাকে সমান মর্যাদা দেওয়া হবে সরকারের এই প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও আপনারা মার্জারকে তাড়িয়েছিলেন কেন? আমরাও নারা লাগিয়েছি পঞ্জাবির জন্য পঞ্জাবি সুবা চাই। পূর্বে বাংলা, পশ্চিমে পঞ্জাব—এই দুটো রাজ্য গ্রাস করাই ছিল হিন্দিওয়ালাদের খোয়াব। বাংলা তার সমুচিত জবাব দিয়েছে, পঞ্জাবও দিক।

সর্দারজি উঠে পড়লেন—সৎশ্রী অকাল। মেরী মঞ্জিল আ গয়ী।

পঞ্জাবে একটা গুরুতর অসন্তোষের আভাস পেলাম সর্দারজির কথায়। কে দায়ী জানি না—মাস্টার তারা সিং অথবা হিন্দি-বাদির দল? কিন্তু এ বিষয়ে দ্বিমত নেই যে পঞ্জাবে আজ একটা নতুন সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তার নাম হিন্দু-শিখ সমস্যা। হিন্দু-শিখের সামাজিক সম্পর্কে আজ গভীর ফাটল ধরেছে। অথচ এদের আচার-ব্যবহার আহার-বিহারে বিশেষ পার্থক্য নেই। বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই এটা একটা কথার কথা মাত্র, কিন্তু পঞ্জাবে হিন্দু-শিখদের সম্বন্ধ ছিল ঘনিষ্ঠতর। হিন্দুজাতির ক্ষত্রিয়শাখা এই শিখ সম্প্রদায়, হিন্দু ধর্ম রক্ষার উদ্দেশ্যেই সিং উপাধিধারী খালসা বাহিনীর সৃষ্টি। মালব্যজি একদিন বলেছিলেন—কেবল পঞ্জাবেই নয় সমগ্র হিন্দুস্থানের ঘরে ঘরে চাই একজন করে শিখ। অমৃতসরের

গুরুদোয়ারায় হিন্দু দেবতারা বহুকাল ধরে বেশ নির্বিঘ্নেই বসবাস করছিলেন, কিন্তু কালচক্রের আবর্তনে তাঁদের হতে হল উদবাস্তু। হিন্দু-শিখের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কেও বাধা ছিল না এতদিন, কিন্তু আজ সেকথা ভাবাও কঠিন হয়ে পড়েছে। বর্তমান যুগে মানুষের অন্তরে মহামিলনের স্বপ্ন, আর ঠিক সেই যুগেই কিনা ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ ভারতের প্রধান দুটি সম্প্রদায়।

চণ্ডীগড়ে যখন ফিরে এলুম তখন ঘরে ঘরে সেঁজুতির আলো। দীর্ঘ যাত্রার পরে গাড়ি থেকে নেমে বড়ো হালকা বোধ হল নিজেকে। যানবাহন সামান্য, লোক চলাচলও বেশি নেই, প্রশস্ত রাস্তা ধরে চলতে চলতে খুবই ভালো লাগল সন্ধ্যার এই শান্ত স্বচ্ছ আকাশ, মধুর নিশ্চিন্ত অবকাশ। আচ্ছা, কলকাতায় এখন কী করতাম। হয়তো একহাতে ব্যাগ, আর এক হাতে ধুতি-চাদর সামলাতে সামলাতে ট্রামের পাদানিতে পা গলাবার দুরূহ চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকতুম। হায় রে কলকাতা, হায় আমাদের ভাগ্য!

শীতের সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে কৌচের মধ্যে বসে আছি। না ঠিক বসে নেই, সর্বাঙ্গে শাল জড়িয়ে চোখ বুজে আধ-বসা আধ-শোয়ার অবস্থা আর কি! মনের মধ্যে বেশ একটা মনোরম অনুভূতি, বেশ একটু আয়েশি ভাব।

খানিকটা দূরে সাংবাদিক বন্ধু তার নিত্যসঙ্গী টাইপরাইটার নিয়ে ব্যস্ত। নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের শেষ ডেসপ্যাচ তৈরি হচ্ছে।

—ক্রিং···ক্রিং···ক্রিং···

বন্ধুর ইঙ্গিতে রিসিভারটা তুলে ধরলুম—হ্যালো ট্রিবিউন স্পীকিং।

ওপার থেকে ভেসে এল মিহিগলার মিঠে আওয়াজ। একে হিন্দি, তায় বামাকণ্ঠ। ভাবুন আমার অবস্থাখানা। দূরভাষিনী জানতে চাইছেন মিস্টার কাপুর এখানে এসেছে কিনা। কাপুরকে যতোটুকু জানি তাতে তাকে ঠিক ঋষ্যশৃঙ্গের উত্তরসাধক বলা যায় না। কে আবার পা বাড়িয়েছে তার খপ্পরে জানতে কৌতূহল হল—হ্যালো, আপকী তারীফ ?

খটাখট বন্ধ রেখে বন্ধুবর বিরক্তিসূচক ভঙ্গিতে এসে রিসিভারটা কেড়ে নিয়ে বললে—এক্সকুজ মাই ইমপারটিনেন্স ম্যাডাম, কাপুর অভী তক নঁহী আয়ে।

—কে ইনি ?

—মিসেস কাপুর।

আমি বে-কুবের মতো দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

খানিক পরেই স্খলিতপদে কাপুরের প্রবেশ—জড়িতকণ্ঠে দীওয়ান-এ গালিব :

দিল মেরা সোজ-এ নিহাঁসে বেমহবা জল গয়া···

বন্ধুবর আবার উঠে এল—অ্যায় কাপুর, তোর দিল ছিলই বা কবে আর জ্বললোই বা কোন তুঃখে ?

কাপুরের রাঙা চোখ তুটো নিরুপায়ভাবে আমার উপর ন্যস্ত হল। ভাবখানা—স্ুন লিয়া ? ক্যায়সী বে-রহম শিয়াকত !

সান্ত্বনা দিয়ে বললুম—জানে দীজিয়ে ভাই। মাথা নেই যার মাথাব্যথার সে কী বুঝবে ?

আজার খীঁচনেকে মজে আশিকোঁসে পুছ্;'
ক্যা জানে ওহ্ কি জিস্কা কহীঁ দিল লগা ন হো ?

মদের নেশায় কাপুরের দিল দরিয়া হয়েইছিল, এবারে একেবারে উথলে উঠল। খানিকক্ষণ এলোমেলো নানা আজগুবি কথার ফুলঝুরি কেটে দীওয়ানে-গালিব আওড়াতে আওড়াতে দীওয়ানা কাপুরের প্রস্থান।

মিনিট কয়েক পরে যুগল আগন্তুকের প্রবেশ। বন্ধুবর পরিচয় করিয়ে দিলেন—মিস্টার এণ্ড মিসেস মালহোত্র।

নববিবাহিত দম্পতি। মেয়েটি টিপিক্যাল পঞ্জাবিনী। বসনে ভূষণে আলাপে-সালাপে যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক তেমনটি। রঙটি লালচে ফর্সা—কী বলে ওকে দুধে আলতায়? তবে তাই। নাকটি বেশ চোখা-সোখা—নুকিলা। চেহারা যতোটা লম্বা ততোটা চওড়া নয়—স্লিম। একে তন্বী, তায় শিখরিদশনা। বিম্বাধরের কথা নাই বা বললুম।

মিস্টার মালহোত্র প্রায় গোড়া থেকেই নীরব। চা-পান করা ছাড়া তাঁর যে আর দ্বিতীয় কর্তব্য আছে মনে হল না। কথা বলছিল মেয়েটিই।

আপনি যখন ভাই-সাবের বন্ধু, তখন আপনিও আমার ভাই-সাব, বটে কিনা?

অকাট্য যুক্তি।

একথা-সেকথা নানাকথার পরে মেয়েটি নেমন্তন্ন জানিয়ে বলল—কাল যাবেন আমাদের বাড়ি।

বন্ধু সায় দিল—ইনি তো পা বাড়িয়েই আছেন যাবার জন্য।

—বেশ তবে তাই কথা থাকল।

—আপসোস। আমি আজ রাতেই চলে যাচ্ছি—সাড়ে বারোটার গাড়িতে।

—নহী ভাই-সাব, ম্যাঁয় আপকী বহিন হুঁ। ক্যা আপ মেরা নেওতা নহী মানেঙ্গে?

বার্থ রিজরভেশনের কথা বললুম।

—উসমেঁ ক্যা। একদিন দেরি হলে এমন কী নুকসান? থেকে যান আপনি।

—শুক্রিয়া। এর পরে যখন আসব, স্টেশন থেকে সোজা আপনার ওখানেই গিয়ে উঠব। মনে থাকবে আপনার কথা—ইয়াদ রহেগা।

—হ্যাঁ, ইয়াদ রহেগী, পর···

পরের কথা আর শোনা হল না। বহিনজি আমার গালে যেন এক চড় কশিয়ে দিলেন—পঞ্জাবি জেনানা হিন্দি বলছে, তার সঙ্গে অতো বিশুদ্ধ হিন্দি বলার দরকার কী? তাই ফস ফস করে বলে ফেললুম কিনা—ইয়াদ রহেগা। বহিনজি কেমন কৌশলে শুধরে দিলেন—হাঁ, ইয়াদ রহেগী, পর······

পরে শুনলুম তাঁর পরিচয়। ইউ. পি. আই-র দিল্লি অফিসের প্রাক্তন চিফ ইঞ্জিনিয়ারের মেয়ে। দিল্লিতেই লেখাপড়া। আরে বাবা, দিল্লি? খড়িবোলির খাস এলাকা যে! আর আমি কিনা কলকাত্তাই বাজারু হিন্দি নিয়ে তাঁর সঙ্গে টক্কর খেতে গিয়েছিলুম! রাইটলি সারভ্ড!

বহিনজি না-ছোড়-বন্দী। অবশেষে প্রস্তাব করলেন—আজ নৈশভোজন তাঁরই গরিবখানায় এবং সেখান থেকে সোজা স্টেশন।

—কী খাওয়াবেন শুনি? অত্যন্ত অভদ্রভাবে প্রশ্ন করে বসলুম। কিন্তু বহিনজির চোখেমুখে শরারতি হাসি। হাসতে হাসিতেই বললেন—কী আর খাওয়াব? ছলিয়াঁ দী রোটী, সরিয়াঁ দা সাগ, হরী মিরচ তে বড়া সোয়াদ। মকাই-এর রোটী, সর্শে পাতার শাক, একটু কাঁচা লঙ্কা, খেয়ে হবেন অবাক।

ওরে বাবা, এযে দেখছি আমাদের মঙ্গলকাব্যের ভোজন

তালিকা। কিন্তু আমি একটা পাল্টা প্রস্তাব করে বসলুম— খাওয়া দাওয়া পরে হবে, আগে শোনান আপনার গান। পহলে গানা, ফির খানা।

প্রথমে তো ভারি লজ্জা। একে অপরিচিত, তায় বাঙালি। ট্যাগেরের দেশ থেকে গিয়েছি—হেমন্ত্‌কুমার, পঙ্কজকুমার, এস. ডি. বর্মনের বংগাল থেকে। আমাকে শোনাবে গান?

উৎসাহ দানের ভঙ্গিতে বললুম--শরমাতি কিউঁ? আমার সামনে লজ্জা কিসের? দু-দিনের অতিথি বই তো নয়, সির্ফ দো দিনকে লিয়ে মেহমান।

আমার কথার মধ্যেই যে গানের আভাস ছিল সে কি ছাই আমিই জানতুম? মিসেস মালহোত্রের লজ্জা-কম্প্র কণ্ঠে ধীরে ধীরে স্বর ফুটে উঠল:

দো দিনকে লিয়ে মেহমান ইহাঁ,
মালুম নহীঁ মঞ্জিল কাহাঁ।
দো দিন কে লিয়ে···

এরপরে আর অনুরোধের প্রয়োজন হয়নি। পঞ্জাবিনীর কণ্ঠ থেকে বয়ে চলল গানের মুক্তধারা।

রাত সাড়ে বারোটা। গমগম করে ছুটে চলেছে কালকা-দিল্লি-হাওড়া মেল। নির্জন কামরায় আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম। লৌহচক্রের বিচিত্র আবর্তন-ধ্বনির মধ্য থেকে ঐ গানের স্বর ভেসে আছে না!

দো দিনকে লিয়ে মেহমান ইহাঁ
মালুম নঁহী মঞ্জিল কাহাঁ।
দো দিনকে লিয়ে······

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৬০ ॥ প্রকাশক : বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, ৩৮ কালী মজুমদার রোড, কলকাতা-৩২ ॥ প্রচ্ছদ : গণেশ বসু ॥ প্রচ্ছদ মুদ্রণ : রিপ্রডাকশান সিণ্ডিকেট, ৭/১ কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রিট, কলকাতা-৬ ॥ বাঁধাই : ইস্টেণ্ড ট্রেডার্স, ২০ কেশব সেন ষ্ট্রিট, কলকাতা-৯ ॥ মুদ্রক : সুশীলকুমার ঘোষ, মা মঙ্গলচণ্ডী প্রেস, ১৪বি শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

দু-টাকা

GOVERNMENT OF TRIPURA

-FICE OF THE DEPUTY CHIEF MINISTER

AGARTALA.

Dated...